অচিন পাখীর সুর

শক্তিপদ রাজগুরু

জয়মালা

২৯/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীঅমলকুমার ঘোষ
জয়মালা
২৯/২ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীমৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

অচিন পাখীর সুর

মহানন্দ রায়চৌধুরী বলেন—তাহলে ওই কথাই রইল। তোমরা পাঁচজনে মাথা হয়ে এ কাজটা তুলে নাও। এতদিনের ব্যাপার।

সতীশ ডাক্তার দেবগ্রামের নোতুন লোক। ক'বছর এসেছে। বয়সেও বেশী নয়। তবে ছোকরা ক'বছরেই ধ্বসেপড়া দেবগ্রামের অনেক মানুষের ধাতপাত জেনে ফেলেছে।

এই মানুষগুলো এখনও সেই অতীতের গৌরবের স্বপ্ন নিয়েই বাস করছে। অবশ্য দোষ তাদের নয়, দেবগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এমন একটা দুর্গম পরিবেশে যে সেখানে আজকের সভ্যতার প্রবেশ সহজে ঘটা সম্ভব নয়।

ইদানীং পাকা রাস্তা একটা হয়েছে, সদর শহর থেকে মহকুমা শহর পার হয়ে জেলার শেষ সীমান্তে এই দেবগ্রামের কাছে এসে শেষ হয়েছে। এরপরই শুরু হয়েছে ময়ূরাক্ষীর বিস্তীর্ণ বালুচর। ওদিকে কুয়েনদীর বাড়তি জল আর কাণা ময়ূরাক্ষীর জল মিশে বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্গম হয়ে ওঠে।

তবু দেবগ্রাম এই অঞ্চলের মধ্যে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এককালে এর দাপট—ওই রায়চৌধুরী কর্তাদের রমরমার কথা এই অঞ্চলে দিনের আলোর মত প্রকাশ পেতো! এখন এদের বিভিন্ন শরিকানদের বিরাট প্রতাপের কিছু টিকে আছে মাত্র। শেওলা ধরে বিবর্ণ—প্রাসাদে গজিয়েছে বট অশত্থের গাছ, সাজানো বাগানের সীমা প্রাচীর ভেঙে আজ সর্বজনীন মাঠে পরিণত হয়েছে। বড় বড় দিঘী—সাজানো পামগাছ—প্রাচীন ইউক্যালিপটাসের সাদা ভুতুড়ে কাণ্ডগুলো চাঁদনী রাতে অতীতের বৈভবের হারানো স্মৃতির কথাই স্মরণে আনে।

তখনকার ঐ রমরমার দিন থেকে এই মেলার পত্তন।

নদীর ধারের বিস্তীর্ণ আমবাগানের সমৃদ্ধি কমে গেছে; জ্বালানী হয়ে গেছে বেশ কিছু ভালো জাতের আমগাছ, দু'চারটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে মাঠে,—চরে। ওইখানে মেলার আসর বসে। এদিগরের জমাটি মেলা।

কোন এক বৈষ্ণব মহাজনের নামে এই মেলার আয়োজন। পাণ্ডব বর্জিত এই অঞ্চলের লোকের কাছে বৎসরের অধিকাংশ দিনগুলো অভাব আর কঠিন পরিশ্রমের বেদনায় বিবর্ণ—আঁধার ঢাকা।

তাই এই মেলার উৎসবমুখর দিনগুলো তাদের কাছে পরম আনন্দের। এই আনন্দের স্মৃতি নিয়ে বহু কাঠফাটা রৌদ্রতপ্ত দিন, ময়ূরাক্ষীর তপ্ত বালুচরের জ্বালা—বর্ষার দুকূলপ্লাবী বন্যার দুঃখভরা আতঙ্কময় প্রহরগুলোকে ওরা অতিক্রম করে।

...এবারও মেলার আয়োজন হচ্ছে। সতীশ ডাক্তারের কাছেও এই দিনগুলো অর্থবহ।

হারাণ আদক বলে—তাহলে যাত্রা লেটো—ঝুমুর এসবের জন্য বায়না করে আসি। সাঁইথেয় এসেছে বিপিন অপেরা—যা গাইছে শুনলাম আহা! আর বিন্দুবালাকেও খপর দিই। সাঁইথেতে দেখলাম গো—ঝুমুর দল যে এমন গাইতে পারে, নাচতে পারে জানা ছিল না, কি গো দেবুদা—আনি ওদের, কি বলো?

ওদের এবার আয়োজন পর্ব শুরু হয় পুরোদমে। তারই মিটিং বসেছে।

দেবকণ্ঠ বাড়ুজ্যে এক পাশে চুপ করে বসে ছিল, বয়স হয়ে গেছে, পাকা আমের মত টুকটুকে রং আর পরণে দেশী ধুতি। পুরোনো হলেও পানজাবীটা ফিনফিনে আদ্দির। আর অত্যধিক কাচার ফলে কিছুটা বিবর্ণ, তবু দেবকণ্ঠবাবুর সৌখিনতার পরিচয় তাতে ফুটে ওঠে।

দেবকণ্ঠ বলে—ওসব গানের আমি তেমন কিছু বুঝি না। তোমরা পাঁচজন যদি আনতে চাও আনো। মেলা জমজমাট হওয়া নিয়ে কথা

ওদিকে বসেছিল ফরাসে আরও কিছু লোকজন। এ গ্রামের মানী লোক। ওদের মধ্যে থেকে আদক মশাই বলে—তোমার ওই এক হা হা তা না না কে বুঝবে বলো। কি চৌধুরী মশায় ?

মহানন্দ চৌধুরী দেবকণ্ঠের বেদনাহত মুখের দিকে চাইল মাত্র। জানে দেবকণ্ঠ ওই সব কথায় দুঃখ পায়। তাই ও সব প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে— এখন ওসব কথা ছাড়ো দিকি। সামনের কাণ্টা উদ্ধার করো।

মহানন্দ চৌধুরীই এখনও রায়চৌধুরী বংশের শরিকানদের মধ্যে এখানে বহাল হয়ে আছে বেশ জাঁকিয়ে। অন্য শরীকদের অবস্থা পড়ে গেছে, জমিদারীও নেই।

ফলে শহরে কেউ কোলকাতায় কেউ দুর্গাপুরে লোহা কারখানায় চাকরী-বাকরী নিয়েছে। আর জমিদার শ্রেণী লোপাট হবার পর বাজারের ওই হারাণ আদক, শম্ভু দত্ত, জানকী পাল এরাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে নানা ব্যবসাপত্র করে। বাচস্পতিমশায় বলেন—এ যুগ বৈশ্য-যুগ হে।

বাচস্পতি মশায় অবশ্য নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। অতীতে তাঁর পূর্ব পুরুষ ধরণীধর দেব শর্মা ছিলেন এ দিগরের নামকরা গাইয়ে, তাঁর গলায় সাতটি সুর তাদের শ্রুতি নিয়ে ফুটে উঠতো।

মহিম রায়চৌধুরী তখন বড় তরফের দশ আনির জমিদার। তিনিই বাচস্পতিমশায়ের পূর্ব পুরুষকে এখানে এনে ভূমি গৃহদান করে স্থিতু করেন। দেবগ্রামের সঙ্গীতের ধারা সারা জেলায় প্রবাহিত। তাদের ঘরানার গান আজ যেন ময়ূরাক্ষীর বালিচরের মরা জলধারার মত দাবদাহে ধুঁকছে। দেবকণ্ঠ এই বাচস্পতিমশায় সেই ধারার শেষ ধারক। এবার লুপ্তপ্রায়।

ওই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারার সঙ্গে জমিদারী নবাবী ইত্যাদির কেতায় একটা অদৃশ্য বাঁধন রয়ে গেছে। আজ সেই জমিদারী প্রথা

বিলোপ হয়ে গেছে। রাজারাজড়াও নেই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কদরও কমে গেছে।

আজকের কর্মব্যস্ত মানুষের সময় নেই এতখানি বসে রাতজেগে মালবকৌশিক বেহাগ দরবারীর আলাপ শুনবে। বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের বৃষ্টিধারার সুরভরা রাতে শুনবে মেঘ-মেঘমল্লার-এর আলাপ। দিনশেষের পড়ন্ত বেলায় ফুলবনে বসে শুনবে জয়জয়ন্তী ভীমপলশ্রী মূলতানের সুর।

আজ মানুষ অনেক বদলে গেছে। আরও হাল্‌কা হয়ে গেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, তারই প্রভাব পড়েছে তাদের শিল্পকলা-সাহিত্য সব কিছুর উপর। আর অর্থই সবচেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে। অর্থই একমাত্র কৌলিন্য রুচির পরিচয়। সমাজের নোতুন মানুষের কাছে তাই আজ সব কিছুই বদলে গেছে।

দেবকণ্ঠবাবুর এতদিনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা হয়ে গেছে অর্থহীন। কেউ আর শোনে না, হয়তো পছন্দ করে না। আর মহানন্দ রায়চৌধুরীদের বংশের ওই নাম ডাকও মুছে আসছে।

এই গ্রামীন সমাজে তাই মাথা তুলেছে আজ হারাণ আদক, জানকী পালদের মত কিছু মানুষ। একপুরুষেই ব্যবসা করে এখানের গঞ্জে কিছু টাকা রোজকার করে এখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। জানকী পালের বাবা মাথায় করে পান-এর মোট নিয়ে এহাট সেহাট ঘুরে পান বিকতো। তার ছেলে জানকী পাল দোকান ফেঁদে বসে রাতারাতি নানা কৌশলে সিমেন্ট লোহা ধান চাল-এর কারবারী হয়ে পয়সা করে এখন পালমশাই হয়েছে, আদক মশাই-এর অতীত পরিচয়ও তেমনিই একটা কিছু। রায়চৌধুরীদের ছোট তরফের গোমস্তা ছিল আদক মশাই-এর পিতৃদেব। করিৎকর্মা ব্যক্তি।

তার কারসাজিতে এখন তস্য সন্তান হারাণ আদকও বড় জোতদার

ধানকলমালিক আর ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। পার্শ্বচর জুটতেও দেরী হয়নি।

জমিদার বাড়ীর বৈঠকখানায় যাদের দেখা যেতো; সকাল সন্ধ্যা বড়বাবু, ছোটবাবুদের সঙ্গে উঠবস্ করতে, তারাই এখন আদক মশাই পালমশাইদের পার্শ্বচর হয়ে উঠেছে।

তবু মহানন্দ রায়চৌধুরীদের ন'তরফ এখন টিকে আছে। মহানন্দবাবু কিছুটা হিসেবী, সংযমী শান্ত প্রকৃতির মানুষ। বিশেষ খর্চা নেই।

একমাত্র মেয়ে বাসনা আর তিনি। দু'একজন ঝি চাকর যেটুকু না থাকলে নয় তেমনি আছে। তাই বোধ হয় চলে যাচ্ছে কোন রকমে। বিরাট প্রাসাদ-এর কিছুটা অংশকে এখন মেরামত করে রেখেছেন। দোল দুর্গোৎসব রাস ইত্যাদি উৎসবের ধারাটাও বজায় রেখে চলেছেন।

অনেকেই বলে, ওর ঠিক চলে যাবে। আকবরী মোহর-সোনা-দানা রায়চৌধুরী বংশের বেশ কিছু গুপ্তধন ওর মহলেই মাটির নীচে কোথায় পোতা ছিল, তার সন্ধান পেয়েছেন উনিই।

অন্য শরিকানদের অনেকেই তো নেই এখানে। যারা দু'চারজন আছে তাদের ফাঁকি দিয়ে ওই গুপ্তধন সব নিজেই দখল করেছে।

বদন অবশ্য কথাটা কোথায় একদিন বলেছিল। আর গঞ্জের অনেকেই জানে বদন মহানন্দবাবুর ওখানে প্রায়ই যায়। ওর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ তাই। সুতরাং বদনের ওই খবরটা অনেকেই বিশ্বাস করে নিয়েছে।

হারাণ আদকের পিতৃদেব ছিলেন ওবাড়ির গোমস্তা। পিতৃদেব বেশকিছু জমি বাগান পুকুর বাঁহাতি করে নিজেই দখল করেছেন। তাই হারাণ ভেবেছিল তার পিতৃদেব গুপ্তধনের ব্যাপারটা ঠিক জানতে পারেননি তাহলে নিশ্চয়ই ওটা তার দখলেই আসতো। এখন সেটা বেহাত হয়ে যাওয়ায় হারাণ আদক মনক্ষুন্ন হয়েছে। তবু শুধোয়।

—কি রকম পরিমান সোনা দানা আছে রে বদন ? ওই আকবরী মোহরের কথা বললি ক' ঘড়া আন্দাজ হবে ?

বদন সেটা সঠিক জানে না। তাই বলে—হবে কত্তা দু'চার ঘড়া

সেই অদৃশ্য ধনের মোহে তবু মহানন্দবাবুর নামডাক কিছু রয়ে গেছে। এরা তাকে সমীহ করে চলে। তাই মেলাকমিটির চেয়ারম্যান তিনিই হতে পারেন। আরও দুচারটে ব্যাপারে তাঁকে মেনে নিয়েছে এরা। কারণ ওই জমিদার বাড়ির অতীত পরিচয় নয়। সেই গুপ্তধনের নাম শুনেই এরা মহানন্দবাবুকে সমীহ করে—যেন ওর হাতে কি এক অজানা প্রভূত সম্পদই রয়ে গেছে।

আর আজকের এই অর্থ কৌলিন্যের দিনে সেই অদৃশ্য সম্পদের খবরটা মহানন্দবাবুকে বর্মের মত ঘিরে রেখেছে।

মহানন্দবাবু আর তার মেয়ে বাসনা এদের কাছে তাই সম্মানিত লোক।

অবশ্য মহানন্দবাবু সেটা জানেন, তিনিও মনেমনে হাসেন মাত্র। আজ মেলা কমিটির মিটিং-এ নানা কাজের কথার আলোচনা হয়ে সব বিষয়ে এক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ওই সম্বর্দ্ধনা দেবার সিদ্ধান্তটা কিছু তিক্ততার পর এখনকার মত মুলতুবি রইল। ওটা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। মহানন্দবাবু বলে—ও নিয়ে তোমরা যা ভালো বোঝো করো, আমি নেই!

এখন অনেক কাজ বাকী। মহানন্দবাবু বলেন মেলার এইসব ব্যবস্থা হোক, মেলা জমুক। পরে ওসব তোমরা ঠিক করো সকলে। আমি না থাকলেও চলবে।

মেলার জায়গার ওদিকে তখন কয়েকটা আম-কাঁঠাল গাছ ছায়া-ঘন করে রেখেছে জায়গাটাকে। নদীর ধারেই বাগানটা। এককালে

ন'তরফের জমিদার বাবুরা সখ করে বাগান আর মন্দিরটা করেছিলেন। এখন ময়ূরাক্ষীর জলস্রোত শুকিয়ে গেছে প্রায়, জমে উঠেছে বালির পাহাড়। এই বালির বুকে কোনমতে জলের একটা ধারা তির্‌তির করে বয়ে চলে—যেন দেবগ্রামের ক্ষীণ জীবনধারার সঙ্গে ওর মিল আছে। কোনমতে বয়ে চলেছে মাত্র।

এদিকে নির্জন মাঠ—নদীর চরে এখন সারবন্দী দোকানঘর উঠছে। দল বেঁধে গরুর গাড়িতে করে বাঁশ-খুঁটি, করোগেট টিন, টেবিল, নড়বড়ে টিনের চেয়ার, তক্তা চাপিয়ে দোকানদাররা জাম্বশ্বরের মেলা শেষ করে বাদশাহী সড়ক ধরে এখানের মেলায় এসে জমেছে। ধূলোভরা রাস্তায় দিন শেষের আলোয় রাঙা হয়ে ওঠে ধূলিজাল।

ওদিকে হরি শীল—বদন ঘোষ মেলা কমিটির তরফ থেকে মনিহারী পটি সন্দেশ পটি লোহা পটি এ সবের এলাকা নির্দেশ করে দোকানদারদের অস্থায়ী ঘর তোলার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে।

মহানন্দ চৌধুরী পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসে। এখানে ওই ছোট পুকুরের চাতালটা ফেটে গেছে, সেই চাতালের বাঁদিকে সারবন্দী কাঁচা তাল পাতা—শরকাঠির বেড়া দেওয়া ঘর উঠেছে। ঝুমুর দলের অস্থায়ী বাসস্থান করা হচ্ছে এখানে।

—পেন্নাম হই গ' ল কত্তা।

মহানন্দ চৌধুরী চাইল মেয়েটির দিকে। চেনা মুখ, যৌবনের সেই বাড়বাড়ন্তের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে চৌধুরীর। চোখ উঁচিয়ে দেখে ওকে।

—তুই! নন্দ! তাহলে এলি বল? ভালো আছিস তো?

নন্দরাণীর চোখে মুখে বয়সের ছাপ-এর সঙ্গে মিশেছে ওর দেহটার ওপর মাতামাতির অনেক চিহ্ন। এককালে নন্দরাণী যে দেখতে শুনতে ভালোই ছিল সেটা ওর দীঘল চেহারা—ডাগর চোখ দেখলে মনে হয়। শরীরের খাঁচাখানা আজ সময়ের পোড় খেয়েছে—আর গায়ের

নিটোল চামড়াগুলো কুঁচকে গেছে। এই পথের মেয়েদের গলার মাধুর্য আর থাকে না বয়সকালে, পুরুষালী ভাব ফুটে ওঠে। এক কর্কশ গলায় নন্দ বলে—

আর আমাদের বেঁচে থাকা ল' কত্তা! দিন কেটে গেছে কোনোরকমে। ফি বছরই এই সময়ে মনে পড়ে দেবগাঁয়ের কথা, তাই আসি!

নন্দরাণীর বিচিত্র সংসারের ক'টি প্রাণীকে দেখা যায় ওদিকে ঘুরঘুর করতে। গরুর গাড়ির ছই-এর ভিতর থেকে ওরা নেমে রংচটা টিনের বাক্স তোরঙ্গ কাপড়ের পুঁটলি হাঁড়ি-কুঁড়ি বের করছে। দলের বাঁধনদার ভূষণ এসে হাজির হয়। গলাবন্ধ কোট—কোমরে ময়লা একটা চাদর প্যাঁচানো, চুলের মাঝখানে চেরা সিঁথি।

পথের ধকলে চেহারাটা লাটপাট হলেও ভূষণ-এর চলাফেরায় নটবর নটবর ভাব ফুটে ওঠে। মেয়েদের সঙ্গে দলের হারমোনিয়াম ঢোল গাড়ি থেকে নামিয়ে চৌধুরীমশায়কে চাতালে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে ভূষণ গড় হয়ে দণ্ডবৎ করে দুহাত তার পায়ে ঠেকিয়ে পদরজ সংগ্রহ করার পোজ করে জিবে ঠেকিয়ে সুরুৎ করে একটা শব্দ করে।

চৌধুরীমশায় এ দিগরের নামী লোক—সমঝদার ব্যক্তি; তাই এই ঘটা করে প্রণাম করে সে তাকে।

নন্দরাণী বলে—আমার দলের নোতুন বাঁধনদার।

ভূষণ জানায় হাত জোড় করে—অধমের নাম ভূষণ দাস হুজুর।

চৌধুরী মশাই দেখছে দলের মেয়েদের। নন্দরাণী চৌধুরীর চাহনির অর্থ জানে। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলে চিনতে পারে নন্দ। তাই বলে নন্দরাণী—দু'চার জন নোতুন মেয়েও রয়েছে দলে। শহরের নাচগান জানা মেয়ে। জানেন তো ল' কত্তা, দিনকাল বদলেছে। তাই আমাদেরও হাল-ভোল বদলাতে হয়।

মহানন্দ দেখছে ওই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের। আটপৌরে রূপে ওদের ঠিক চেনা যায় না। মোটামুটি পাঁচপাচি ধরনের লাগে।

তবে ওদের আসল রূপ চেনা যায় ঝুমুরের আসরে। আধো আলো আঁধারে ভরা আসরে ওই রূপ একটু সাজগোজ ছলাকলায় নাচের দাপটে আর সুরের যাদু নিয়ে যেন এক-একটি মোহিনীতে পরিণত হয়। যৌবনের মহানন্দ চৌধুরী যে মোহিনীকে আবিষ্কার করেছিল ওই নন্দরাণীর মাকে, আজও এতগুলো বছর পার হয়েও সেই অধরা মোহিনীদের যেন ডাক শুনে চলেছে সে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান পার হয়েও। বিস্মৃত একটি সুরের মত।

ক্লান্ত মহানন্দ চৌধুরী আজও যেন তাদের অন্বেষণ করে।

নন্দরাণী বলে—আসরে একদিন পায়ের ধূলো দেবেন ল' কত্তা।

বেলা পড়ে আসছে। মহানন্দ চৌধুরীর আফিমের মৌতাত আছে—চায়ের সঙ্গে আফিমের একটা দলা গিলে ঝিম হয়ে বসে থাকে এই সময়। সেটার প্রয়োজন বোধ করে উঠে দাঁড়ালো। নন্দরাণীর কথায় বলে চৌধুরী :

—দেখা যাক। আজ চলি। সব গোছগাছ করে নে বদন।

বদন মেলার অন্যতম কর্মী। চৌধুরী মশায়ের ডাক শুনে এগিয়ে আসে। চৌধুরী বলে—নন্দদের ঘর জায়গা দেখিয়ে দাও। পুরোনো পার্টি, যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে।

বদন অবশ্য জায়গা পত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে কিছু বকশিস আদায় করে দু'এক টাকা। এখানে সেই মূল্যটা কিভাবে আদায় করবে সেইটা ভেবে নিয়ে বলে—

—ওসব হবেক আজ্ঞা। কিছু ভাববেন নাই, বদন রইছে।

চৌধুরী মশায় মেলার পথ দিয়ে গ্রামে ফিরছে। দেখতে দেখতে শূন্য বালুচরে ভরে গেছে দোকান-পশার। ওদিকে পড়েছে সার্কাস-এর তাঁবু। সিনেমাও দেখানো হবে পাবলিসিটি বিভাগ থেকে। আর বসবে যাত্রার আসর। এর মধ্যে লোকজন বেশ কিছু আনাগোনা করছে, মেলা এবার জমে উঠবে। তবু মহানন্দের কোথায় একটা পরাজয়ের বেদনা কাঁটার মত বাজে।

হারাণ আদক আর জানকী পাল। ওদের দলের কাছে সে নিদারুণভাবে হেরে গেছে। বাইরে কোন প্রকাশ নেই এই হেরে যাওয়ার জন্য। তবু এটাকে ভুলতে পারে না মহানন্দ চৌধুরী।

দেবকণ্ঠবাবুকে এই মেলায় একটু সন্ধান দেখানোর ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিল। দেবগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার বসন্ত চাটুজ্যে এ গ্রামেরই ছেলে, ভালভাবেই কলকাতায় পাশ করেছিল, কিন্তু মুরুব্বীর জোর নেই, তাই গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে। এখানের স্কুলে তাকে ঢুকতে হয়েছিল অল্প মাইনেতেই। মহানন্দবাবুও অবশ্য কমিটিতে আছেন, কিন্তু দেখেছে চৌধুরী মশাই, স্কুলের কর্তৃত্ব গেছে হারাণ আদকের হাতে। তার প্রভাবটা কমে এসেছে।

অবশ্য হারাণ-এর কাছে পাশের হিসাব হয় একটা দুটো সবই এই দরে। কারবারী লোক সে, গোনাগুণতির ব্যাপার বোঝে। এম-এ পাশ-এর যে আবার ক্লাশ আছে জানে না। তার সিমেণ্ট লোহা কলাই চাল-এর হিসাব জানা দরকার। সেটা জানে।

তাই তার ভাগ্নে বহরমপুরে পাশ দিয়েছে। তাকেই বহাল করতে চেয়েছিল। কিন্তু নেহাৎ চাপে পড়ে এম-এ পাশ বসন্তকেই নিতে হয়েছিল সতীশ ডাক্তারের কথায়। মহানন্দ চৌধুরীর ব্যাপারে বলেছিল হারাণ—ওনার কথা ছেড়ে দেন ডাক্তারবাবু, নামেই তালপুকুর ঘটি ডোবে না। আমার কাছেই ওই দীঘি বাগান বন্ধক দিয়েছেন। সুদও পাই নি বন্ধকী টাকার।

সতীশ ডাক্তার এসবে থাকতে চায় না। তাই ওদের লেনদেনের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। বসন্তের চাকরি হয়েছে তাতেই সে খুশী। অবশ্য মহানন্দ চৌধুরী সেটা শুনেছিল।

এবার মহানন্দ চৌধুরী বৃদ্ধ গায়ক বাচস্পতি মশায় আর দেবকণ্ঠকে মেলায় পঞ্চজনের সামনে সম্বর্ধনা জানাতে প্রস্তাব করেছিল। এস ডি ও সাহেব আসবেন উদ্বোধনের দিন।

বসন্তও প্রস্তাব শুনে বলে—এ সাধু প্রস্তাব। এই এলাকার কেন, জেলার মধ্যে গুণীলোক ওরা। ওদের সম্বর্ধনা জানানোর দরকার। ভালই হবে।

জানকী পাল সাধারণতঃ কথা কম বলে। পাক দেওয়া মিনমিনে চেহারা, আর শীর্ণ বাহুতে কপালে তিলক ছাপ এঁকে বসে থাকে। লোকে বলে—ওটি একটি চিতা বাঘ। তাক বুঝে লাফ দেয় হে।

জানকী পালকে এবার কর্মবীর হিসাবে এবং হারাণ আদককে দেশ সেবক হিসাবে সম্বর্ধনা জানাবার কথাটা তাদের কিছু প্রিয়জন ওই নটবর, গুপীনাথ, বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী প্রিয় দত্ত আগেই ঠিক করেছে। তাই ওই দেবকণ্ঠ আর বাচস্পতিকে সম্বর্ধনা জানাবার কথায় নিতাই দাস বলে ওঠে—আজ্ঞে ওই লোক তাড়ানো গাইয়েদের আবার আসরে বসাবেন? তাদের ঘটা করে কলাচন্দন নৈবিদ্যি দিতে হবেক?

নটবর বলে—অয় বাপ্। ইয়ে মেলার লোকগুলাদের গান করা দেখলে তেরিয়া হয়ে উঠবেক গ!

সতীশ ডাক্তার বলে ওঠে—কি বলছো নিতাই!

ওদিক থেকে বিপ্রপদ শোনায়—ঠিকই বলছে আজ্ঞা। ওই সব রেখে দিয়ে আদক মশাই, পাল মশাই, মালা গড়ানো হবে। ত্যানাদের এলেম কিসে কম বলুন?

জানকী পাল মৃদু মৃদু স্বরে বলে—আবার আমাকে কেন এসবের মধ্যে টানা? কি আর করেছি বলো যে ঘটা করে মালা পরাবে।

অবশ্য মুখেই ওই কথাটা বলে জানকী পাল। মনে মনে এটা চায় সে। আর সেটা প্রকাশ করেছে নটবরের কাছে। নটবরও তাই কথাটা তুলেছে। নটবর বলে—আপনি চুপ কর পালমশাই। এটা বিজ্ঞজনের ব্যাপার। আদক মশাইও কিছু বলতে চায়। বিনীত ভাবে। কিন্তু তার আগে তাদের দলবল হৈ চৈ করে—ওসব কথা শুনবো না। আমাদের কথামত কাজ হবে।

বিপ্রপদ ইদানীং কোন কোন মিটিংও শুনতে যায় কান্দী শহরে। সে শীর্ণ শিরাবহুল হাতটা ওপরে তুলে বকের মত লম্বা গলা হেলিয়ে বলে—আমাদের দাবী মানতে হবে।

হাসছে আদকমশাই।

দেবকণ্ঠ—বাচস্পতি মশায়-এর কানেও কথাটা উঠেছিল। বাচস্পতি বলেন—ওসব করা কেন? মহানন্দের মত বাজে ভাবনা।

দেবকণ্ঠবাবু কথাটার কোন গুরুত্ব দেয় নি। দুঃখ সে পেয়েছিল এতবড় অবজ্ঞার পরিচয়ে, ওই অবজ্ঞা আজ তাদের কাছে নোতুন নয়। আজীবন গ্রামের পরিবেশেই কাটিয়েছে দেবকণ্ঠবাবু, তখন পূর্ণ যৌবন। তার ভরাটি সুরেলা গলায় গান-এর খবর রাঢ় বাংলায় পরিচিত।

বিষ্ণুপুরের গোঁসাইজী বলেছিলেন—কলকাতায় এসো দেবকণ্ঠ। কলকাতার প্ল্যাটফর্ম না হলে প্রচার হবে না। এতবড় প্রতিভাকে গ্রামের মধ্যে আটকে রেখো না।

দেবকণ্ঠবাবু দু'একবার কলকাতার আসরে গাইতে এসেছিলো। কলকাতায় অর্থ-সম্মান পেয়েছে। কিন্তু প্রাণের সাড়া এখানে মেলে নি। মহানন্দ চৌধুরীও বলেছিল গ্রাম থেকে আসার সময়—আমাদেব ভুলে যাবে নাকি হে কণ্ঠ কলকাতায় যেয়ে?

কলকাতায় এসেও কিন্তু দেবকণ্ঠের বার বার মনে পড়ে দেবগ্রামের স্নিগ্ধ ছায়াঘন পরিবেশ। সেখানের শান্ত জীবনযাত্রা—বৈকালে চৌধুরী বাড়ির আসর। বাতাসে বকুল, মুচকুন্দ, চাঁপার সুবাস জাগে।

ময়ূরাক্ষীর বালুচরে আগত সন্ধ্যার অন্ধকারে ভেসে ওঠে দেবকণ্ঠের গলায় ইমনের সুর।

অন্ধকারে চুপে চুপে সন্ধ্যা নামছে, আকাশের সীমান্তের রং মুছে যায়—পাখীদের কলরব জাগে। এমনি দিগন্তজোড়া শূন্যতার অন্ধকারে যেন পায়ের ভীরু শব্দ ওঠে। রহস্যময়ী অধরা ইমনের রাগরূপ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে দিগন্ত জুড়ে।

সেই জগতকে ভুলতে পারেনি দেবকণ্ঠ।

তাই দেবকণ্ঠ গ্রামেই ফিরে আসে আবার। আর গ্রামে আসার অন্য কারণও রয়েছে। তার একমাত্র মেয়ে গৌরীকে রেখে গেছে গ্রামে মা মরা মেয়ে, তাই কলকাতা শহরে এসেও গ্রামের কথা মনে পড়ে। ফিরে আসতে হয়েছিল তাকে।

তখন গৌরী অনেক ছোট। তার স্ত্রী একমাত্র মেয়ে গৌরীকে ফেলে এই শান্ত জগৎ ছেড়ে সে কলকাতায় থাকতে পারবে না। মল্লারের রূপ এখানে যেন বর্ষার মেঘছায়ায় রূপায়িত হয়ে উঠে। আকাশ জুড়ে কাল মেঘের দল নদীর ধারে সারবন্দী তালিধ্বজের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গ্রামসীমা পার হয়ে যায়—বাতাসে ওঠে মেঘের গুরুগুরু ডাক ছাপিয়ে উন্মত্তা ময়ূরাক্ষীর কলগর্জন। বৃষ্টি নামে। সবুজ মাঠ গাছগাছালির মাথায় নদীর জলে ওঠে বৃষ্টির ছন্দ। দেবকণ্ঠের মেঘমল্লারের বন্দেজ যেন রূপায়িত হয় প্রকৃতির ওই আঙিনায়।

...গৌরীকে নিয়ে বসেছে দেবকণ্ঠ। তার গলায় দেবকণ্ঠ ওই সুর বসাতে চায়। মেয়েটাও বাবার সঙ্গে ক্রমশ গলা মেলায়।

আজ গৌরী বড় হয়েছে। দেবকণ্ঠ মাঝে মাঝে অতীতের দিকে চেয়ে ভাবে—তার সব হিসাব কোথায় গড়বড় হয়ে গেছে।

অতীতের সেই দিনে যদি এখানের মায়া ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতো আজ সে পেত নাম—প্রতিষ্ঠা—অর্থ। আর একমাত্র

মেয়ে গৌরীকে নিয়ে এই অভাবের মধ্যে দিন কাটাতে হ'ত না এখানের এই গ্রামে।

আজ নিজের জন্য নয়, গৌরীর জন্যই এই বেদনাটা বোধ করে।

নিজের বয়স হয়ে গেছে, জমিদার গোষ্ঠীও নেই, আর শহর-সদরে-ও তার শিষ্যদের ভিড়ও হারিয়ে গেছে। এখন রেডিওতে শোনে যে সব গান, সেগুলোকে গান ছাড়া অন্যকিছু বোধ হয়। শহরেও দেখেছে সিনেমার গানই গায় লোকে। তাই তারা সব বিস্মৃতির অঙ্গনে হারিয়ে গেছে। মার্গ সঙ্গীতও ভুলে গেছে।

মহানন্দ চৌধুরী তবু তাকে সম্মান জানাবার কথাটা পেশ করেছিল সেদিনের মেলা কমিটির মিটিং-এ। তাই নিয়েই গোলমাল বাধে। বসন্তবাবু বলে—এ নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই।

বিপ্রপদ হারাণ আদকেরা ওখানেই দালালি করে। সে জেদ ধরে।

ফয়সালা এখানেই করতে হবেক ম্যাস্টার। এই মিটিং-এই।

মহানন্দবাবুই এসব দেখে বলে—তোমরা যখন চাইছো না তাহলে দেবকণ্ঠকে বাদ দেব।

বসন্ত মাষ্টারই শুনেছে চৌধুরী মশায়ের সেই আর্তকণ্ঠস্বর। আজ যেন ওরা তাকেই অপমান করেছে। দেবকণ্ঠকে নয়।

কিন্তু জানকী পাল, হারাণ আদকের দল তখন নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিয়ে মত্ত। নটবর বিজয় হেমদত্ত যেন জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে—ওসব কণ্ঠফণ্ঠকে নয়, পালমশাই আর হারাণ আদককেই সম্মান জানাতে হবেক।

...মহানন্দ চৌধুরী তখনকার মত চুপ করে গেছল। কিন্তু একটা কঠিন সত্যকে দেখছিল সে। যুগ বদলেছে। ওই বাচস্পতি মশায়ের

কথাটা সত্যি—বৈশ্যযুগ বাবা। অর্থের কৌলিন্যই এখন বড় কথা, বাকি সব বাহ্য।

তাই আজ রায়চৌধুরী পাড়ার সব কিছু স্তব্ধতার অতলে চাপা। পড়ে গেছে। সেও হেরে গেছে।

এই পরাজয়ের খবরটা সে বাইরে প্রকাশ করতে পারে না, তাই সবকিছু উৎসব আয়োজনে পঞ্চায়েত বোর্ডে টিকে আছে মহানন্দ চৌধুরী, পাকা ফলের মত। কখন একেবারে নিঃশব্দে খসে পড়বে তারই প্রতীক্ষায়। তবু মহানন্দ চৌধুরী শক্ত ধাতের মানুষ তাই এখনও সব দিক বজায় রেখে চলেছে।

মহানন্দ চৌধুরী বাড়ির দিকে ফিরছে। গ্রামের পথে সন্ধ্যা নামছে, গাছ গাছালির বুকে আঁধার ছোঁয়। পাখীদের কলরব শোনা যায়। দু'একটা তারা ঝিকমিক করে আঁধারে।

নির্জন পথে হঠাৎ দেবকণ্ঠকে দেখে চাইল মহানন্দবাবু। দেবকণ্ঠের বাড়ির পাশ দিয়েই চলেছিল সে। দেবকণ্ঠবাবুর কানে গেছে। আজকের জেলা কমিটির মিটিং-এ ওই তিক্ত আলোচনার কথাটা।

বসন্ত মাষ্টার আর মহানন্দবাবু তার হয়ে প্রস্তাবটা তুলেছিল মিটিং-এ ওই ধনীজন সম্বর্ধনার ব্যাপারে। কিন্তু সব ভেস্তে দিয়েছে ওই জানকী পাল আর হারাণ আদকের দল। হারাণ আদকের ছেলে বিনোদও নাকি দলবল নিয়ে আশপাশেই ছিল। যদি ওদের প্রস্তাব ভালো কথায় কার্যকরী না হয় তারাও ঝামেলা বাধাবে।

কিন্তু মহানন্দবাবুই বিরক্ত হয়ে ওদের প্রস্তাবটাকে মেনে নিয়ে চলে এসেছেন।

সন্ধ্যার থমথমে আঁধার নেমেছে মহানন্দবাবুর মুখে। সেটা দেবকণ্ঠের সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায়নি। দেবকণ্ঠ বলে।

—ওসব নিয়ে কেন কথা তুলতে গেলেন চৌধুরীমশায়? কে সম্বর্ধনা দেবে না দেবে এসব ভেবে তো এত কষ্ট করে এই গান শিখতে

যাইনি। আর কলকাতায় না গিয়ে এখানেই রয়ে গেলাম, এতো নিজেরই ভুল। তার জন্য সম্বর্ধনার কথা না তুললেই পারতেন!

মহানন্দ চৌধুরী ওর দিকে চাইলো।

আকাশে দু'একটা করে তারাফুল ফুটছে। বেদনাময় হারানো দিনের স্মৃতিব্যাকুল এই সন্ধ্যার সঙ্গে তাদের দু'জনের জীবনের কোথায় মিল রয়ে গেছে—

বলে মহানন্দ।

—ভুলই করেছিলাম দেবকণ্ঠ। ভুল! ভাবিনি যে এই লোকগুলো এমনিভাবে বদলে গেছে। আজ গুণীর কোন কদর নেই। এখানে বড় হল ওই হারাণ আদক আর জানকী পালরা। তোমার মত প্রতিভার কোন দামই নেই?

মহানন্দবাবুর কথায় দেবকণ্ঠ বলে—এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি? দিন বদলেছে। এই দিনবদলের পালায় সব অতীত, সব পুরোনো কিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। ঝরাপাতার মত ঝরে যাবে। আমরা এটা মেনে নিয়েই খুশী থাকতে চেয়েছি।

মহানন্দবাবু ঠিক এই কঠিন সত্যটা এতদিনেও বুঝতে চায়নি। কিন্তু এবার বুঝতে পারছে অনেক বেদনার!

ক্লান্ত স্বরে পরাজিত মহানন্দ বলে—তাই হয়তো সত্যি হে। চলি।

আঁধার নামে। পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে লোকটি!

তখনও চুপকরে দাঁড়িয়ে আছে দেবকণ্ঠ।

—বাবা!

দেবকণ্ঠ মেয়ের ডাক শুনে চাইল।

গৌরীও শুনেছে কথাগুলো। আজ মেলার মিটিংএ তার বাবাকে নিয়েও কি সব আলোচনা হয়েছে। সে কিছুটা শুনেছে। আর এমনি যে একটা কিছু হবে তার আভাসও পেয়েছিল গৌরী ওই বিনোদ আদকের মুখে।

হারাণ আদকের ছেলে বিনোদ এখন বাপের পাশে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসাপত্র দেখে। আর সেই সঙ্গে গ্রামে মস্তানি করে। গৌরীও হাড়ে হাড়ে চেনে ছেলেটাকে।

গৌরী আজ ওদের সমবেত অপমানটার খবর পেয়ে নিজেও দুঃখ বোধ করে তার বাবার জন্য। এগিয়ে আসে সে।

—বাবা!

দেবকণ্ঠ চাইল ওর দিকে।

মেয়ের চোখেও যেন দেবকণ্ঠ নিজের অন্তরের বেদনা আর পরাজয়টাকে লুকোতে পারেনি। গৌরী বলে:

—ওসব নিয়ে কেন ভাবছো বাবা? ওতো আর নোতুন কিছু নয়। ওদের কাছে কি পেয়েছো তুমি?

দেবকণ্ঠ বাবু হাসলো। মলিন বিষন্ন সেই হাসি।

জানে ওদের সে। এই গ্রামের নোতুন এই মানুষগুলো সেদিন মাথা তুলতে সাহস পায়নি। গ্রাম—আশপাশের গ্রামের শ্রদ্ধেয় লোক ছিল সেদিন দেবকণ্ঠ ওস্তাদ। এক ডাকে চিনতো তাকে।

জমিদার বাবুদের তখন প্রতিপত্তির দিন।

সেইদিন গ্রামের মানুষদের সম্মানের মোহে দেবকণ্ঠ কলকাতায় না গিয়ে এই মাটিতেই ফিরে এসেছিল। তার গান-এর কদর ছিল সারা জেলায়।

আজ দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জনরুচিও বদলে গেছে। তাই ওই লোকগুলোও তাকে অপমান করতে সাহস পায়। অবনত করে ওরা ভাবে আমরা অনেক বড় হয়েছি। খুশী হয় মনে মনে নিজেদের এই প্রতিষ্ঠায়।

দেবকণ্ঠ অনেক বেদনায় সেই ভুলটাকে আজ মেনে নিয়েছে।

মেয়ের কথায় সহজ হবার চেষ্টা করে বলে।

—না রে! ভাববো কেন।

নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—ওদের কথায় গান শিখিনি। আর এতদিন এই পথে থেকে ওদের কথায় জীবনের শেষ পাদে এসে থামব না মা। চল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তোকেও রেওয়াজে বসতে হবে। বুঝলি মা, ওদের এইসব কিছু অপমানের জবাব তোকে দিতে হবে। আমি সেইমত শিখিয়ে যাবো আমার সব গানের বিদ্যা—তোকেই।

...সন্ধ্যার অন্ধকারে পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলো ধ্বংসপুরীর নির্জনতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা একটানা কাছারি বাড়ি—ওদিকে মন্দির নাটমন্দির সব কেমন আঁধারে থমথম করছে। কুলবিগ্রহের মন্দিরে কোনমতে ধূপ প্রদীপ জ্বেলে কাঁসর বাজিয়ে পূজোর নিয়ম রক্ষা করে ঠাকুরমশাই।

...হঠাৎ ঢোলক আর খঞ্জনীর শব্দে দাঁড়ালো মহানন্দ চৌধুরী।

কাছারির ওদিকের দেউড়ি-ফটকের পাশে কয়েকটা একতলা নীচু ঘর রয়েছে। এককালে দেউড়ির গেটে মোতায়েন থাকতো দারোয়ান—প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজতো ঢং ঢং ঢং। এখনও মহানন্দ চৌধুরীর মনে পড়ে শৈশব কৈশোর-যৌবনের সমৃদ্ধির দিনগুলো। অনেক জাগর মুহূর্তে রাত্রির প্রহরগুলো সচকিত হয়ে ওঠার স্মৃতি হয়ে আছে সেই ঘণ্টার শব্দ।

...পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় মহানন্দ ওই ঘরগুলোর দিকে।

এখন রামু দ্বারোয়ান আর তার স্ত্রী লখিয়া ওখানেই থাকে। এতবড় পুরীর দ্বার এখন অবারিত।

পাহারা দেবার মত কোন সম্পদ আব্রু ইজ্জৎ সবই হারিয়ে গেছে। ফাঁকা পড়েছিল ওই লম্বা ঘরগুলো। আঁধার থমথম করতো। ওরা

এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফাইফরমাস খাটে লখিয়া বাসনার। আরও এখানে আছে কয়েকজন।

রামু আর ওর কয়েকজন দেশওয়ালী ভাই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। দেবগ্রামের বাজারে ওরা কখনও আইসক্রীম কখনও পাঁউরুটি চানাচুর এটা সেটা বিক্রী করে। আজ সন্ধ্যায় ওদের গানের আসর বসেছে।

রামুর অবশ্য অন্য ব্যবসাও আছে। এতবড় ছড়ানো ধ্বংসপুরীর কোন খুপরীতে সে নাকি বেশ ফলাও কারবার শুরু করেছে। মাঝে মাঝে তাকে মদে চুর হয়ে থাকতে দেখা যায়, আর লখিয়ার দেহে রয়েছে অফুরান মত্ত যৌবন প্রবাহ।

লখিয়া আজ জমিয়ে বসেছে গানের আসরে।

রামু চীৎকার করে জড়িত কণ্ঠে—চালাও পান্‌সী !...বাহ্‌-বাহ্‌ হ্‌—

কে গানের সুর ভাঁজছে একহাতে কান চাপা দিয়ে। আর রামুর এক সাকরেদ বেধড়ক ঢোল পিটিয়ে চলেছে বেতালা ছন্দে।

মহানন্দ চৌধুরী তফাৎ থেকে ওদের বিচিত্র গানের মজলিস দেখে সরে এল। আগে এ বাড়িতে উঠতো ধ্রুপদের বন্দেজী সুর। গুরু গুরু বাজতো পাখোয়াজ। কোন ওস্তাদের সাধা গলায় কোমল গা আর রেখাবের সমন্বয়ে বাহবা ফেটে পড়তো। আজ সেখানে বসছে জবর দখলের নায়কদের মত্তপকণ্ঠের হল্লা।

এখন দিনগুলো একেবারে বদলে গেছে।

মহানন্দ চৌধুরী চলেছে অন্ধকার পথ দিয়ে। হঠাৎ একটা শব্দে থমকে দাঁড়ালো। বুকে হেঁটে সর্পিল গতিতে একটা সাপ চলে গেল চকিতের মধ্যে। এমনি নির্জন অন্ধকারে তারা চলাফেরা করে এখানে।

হঠাৎ মানুষের পায়ের শব্দে তারা যেন একটু রেগে উঠেছে। বাতাসে তাই ওঠে ফণা তোলা সাপটার হিস্‌ হিস্‌ শব্দ।

মহানন্দ চৌধুরী হাতের লাঠিটা ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেল ভিতরের দিকে। সাপটা সরে গেল।

গৌরীর সুর শোনা যায়। গা হাত পা ধুয়ে সংসারের কাজ সেরে গৌরীর অবকাশ মেলে। সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে সে রেওয়াজ করতে বসে।

গৌরীর কানে গেছে এই হারাণ আদক কোম্পানীর ব্যবহার-এর কথা। গৌরী জানে তাদের সংসারের অবস্থা। আগে তবু স্বচ্ছল ছিল জমিদার বাবুদের দাক্ষিণ্যে। এখন সে দিন নেই। বাবার রোজকারও কমে গেছে। গৌরীও বুঝেছে সব কিছু। তার উপরই অনেক দিন থেকে পেয়েছে সংসারের ভার।
মা মারা যাবার পর থেকে দেখছে এই নিঃসঙ্গ মানুষটার গভীর বেদনাকে। আজ গৌরীর কেমন রেওয়াজে মন নেই। সুরটা ঠিকমত আসছে না নানা ভাবনায়।

দেবকণ্ঠ চুপচাপ বসেছিল। ওই ঘটনাগুলো তার মনে শুধু বেদনাই এনেছে। তবু হঠাৎ গৌরীর রেওয়াজে চাইল।

—নি রে ঠিক লাগছে না মা!

গৌরী বাবার দিকে চাইল। গৌরীর মনে হয় বাবাকে দেখে, এ সাধনার কোন দামই নেই। না হলে ওই মানুষটা আজীবন সুরের সাধনা করে কি পেয়েছে? পেয়েছে শুধু জ্বালা, দারিদ্র্য আর আঘাত।

এক এক সময় গৌরীর মনে হয় সেও ফুরিয়ে যাবে। বাবার কথায় গৌরী তানপুরা নামিয়ে রেখে বলে:

—ভালো লাগছে না বাবা। কি হবে এসব করে?

গৌরীর কথায় চমকে ওঠে দেবকণ্ঠ। আজ গৌরীর চোখের বেদনাময় চাহনিতে ফুটে ওঠে তারই সারা জীবনের পরাজয়ের গ্লানি। এ যেন দেবকণ্ঠের নিজেরই মনের কথা।

দেবকণ্ঠও এবার নতুন করে কথাটা ভাবছে। দিন বদলের পালায় সবকিছু বদলে গেছে। মানুষের রুচি মানসিকতা বিবেক সব কিছু। তাই জীবনযাত্রাতেও এসেছে পরিবর্তন।

আজ মনে হয় দেবকণ্ঠের—গৌরীর জীবনে এই গানের সাধনার কোন প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে সাদামাটা কোন ছেলের সঙ্গে বিয়ে থা দিয়ে কোন ধেনো জোতদারের ঘরে পাঠালে হাতা খুন্তি সংসার ঠেলে তবু বাঁচতে পারবে মেয়েটা। খেয়ে-পরে বাঁচবে।

দেবকণ্ঠ এতবড় পরাজয়টাকেই হয়তো মেনে নেবে বাধ্য হয়ে। এছাড়া পথ নেই।

তাই চুপ করে থাকে সে।

গৌরী বলে—রাত হয়ে গেছে বাবা। খেয়ে নেবে চল।

গৌরী যেন এসব প্রসঙ্গ এড়াতে চায়। তাই খাবার জায়গা করতে উঠে গেল।

তবু গৌরীর কাছে বেশ একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাবাকে এসব কথা বলে নি। লোকটা ঘা খেয়ে খেয়ে এখন যেন কোণে আশ্রয় নিয়েছে। আর গৌরী দেখেছে এখানের কিছু বিচিত্র মানুষের রূপটাকে, যাকে সে ঘৃণা করে।

তার দেখা ছেলেবেলার সেই মানুষ সেই দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনের কোন সুরই মেলে না। কেমন বেসুরো বাজে।

কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগে তার। গৌরী ওসব এড়াতে চায়। কিন্তু পারেনা।

হারাণবাবু বিনোদ আদকের কথা মনে পড়ে। স্কুলে বারকতক হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়ে পর পর ফেল করে এখন কারবারে

নেমেছে। ব্লক অফিসের ঠিকেদারীর কাজ করে আর একটা জিপ হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায় যখন তখন।

কিছুদিন ধরে গৌরী দেখেছে বিনোদকে তার দিকে নজর দিতে। গৌরী সেদিন দত্ত বাড়ির টুইশানি সেরে ফিরছে, চৌধুরীদের বাগানের ওখানটা 'ছায়াঘন-নির্জন', হঠাৎ ওখানে বিনোদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাইল গৌরী। বিনোদ এখন দামী প্যাণ্ট সার্ট পরে, সিগ্রেটও টানে। লম্বা চুল, হিন্দী ছবির ভিলেন মার্কা চেহারা। গৌরী ওকে না দেখার ভান করে চলে আসছিল। হঠাৎ বিনোদই এসে তার সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলে—দেখতেই পাচ্ছ না যে গৌরী।

গৌরী চাইল ওর দিকে। বিনোদকে এখানে দেখে একটু ভয়ই পেয়েছে সে। কিন্তু জানে ভয়টা প্রকাশ করলে ও আরও বেড়ে যাবে। তাই গৌরী একটু কড়া স্বরে বলে—পথ ছাড়ো।

বিনোদ চাইল ওর দিকে। বিনোদ বলে ওঠে—পথ তো ছেড়েই রয়েছি। আমি তো পথহারা পাখী গৌরী, ভেবেছিলাম তুমিই আমার পথ দেখাবে।

গৌরী জবাব দিল না।

বিনোদ ওর নীরবতায় খুশি হয়ে আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলে —তুমি তো গান-টান গাও কান্দীর টকিতে। দারুণ জমাটি একটা গানের বই এসেছে, একদিন চলো, জিপ তো রয়েছেই। সিনেমা দেখে আসবো।

গৌরী অবাক হয় ওর সাহসে। বলে ওঠে সে—আমার যাবার সময় হবে না। আর এসব কথা কোনদিন শুনলে ভালো হবে না বলে দিলাম। সরো।

গৌরী হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায়, তখনও বিনোদ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অপমানটা হজম করতে বোধহয় একটু সময় লাগে বিনোদের। তারপর হাতের জ্বলন্ত সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে বিনোদ গর্জে ওঠে— সতীগিরি। ঢের দেখা আছে অমন সতীপনা।

বিনোদ যে এত সহজে সব কিছু হজম করবে এটা ভাবে নি গৌরী। ওই ছেলেটার সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনে গৌরী অনেকের কাছে। ইদানীং হারাণ আদক-এর দারুণ রোজগার, ছেলেটা তাই বেপরোয়া।

বিনোদ অবশ্য কয়েকদিন পরই গৌরীকে দেখে জিপটা হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড়ালো। চাকায় ব্রেক সু ঘসার তীক্ষ্ণ শব্দ ওঠে।

বিনোদ সচকিত গৌরীকে দেখে বলে—এই দুপুরে কোথায় চললে? অভিসারে?

গৌরীর ফর্সা মুখটা সিঁদুরের মত লালচে হয়ে ওঠে। জবাব না দিয়ে চলে গেল সে বাড়ির দিকে। গলি পথে। বড় রাস্তায় তখনও দাঁড়িয়ে হাসছে বিনোদ।

বলে সে—অবশ্য সঙ্গী হতে রাজি আছি, রথও তৈরী।

গৌরী বাবাকে এসব কথা জানাতে পারে নি, চুপ করে সবকিছু সহ্য করে এসেছে। মনে হয় এই দেবগ্রামের শান্তির দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে, রূপবদলের পালায় এখানের মাটিতে এসে হাজির হয়েছে পুঞ্জীভূত গ্লানি।

এ যেন তার জীবনের ভবিতব্য, তাই মনে হয় পুরোনো সব কিছুই হারিয়ে গেছে, এখানে তাই তার সারা মন কি গ্লানিতে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখান থেকে যেন মুক্তি পেতে চায় গৌরীও।

কিন্তু বাবার দিকে চেয়ে সে বিদ্রোহ করতে পারে নি। তবু গৌরী কথাটা বার বার ভেবেছে, শহরে এখান থেকে সরে যাবার পথই খুঁজেছে। বাবা সেদিন দেবগ্রামের মায়া কাটাতে পারে নি। গৌরী আজ এখান থেকে মুক্তি পাবার স্বপ্নই দেখে মন দিয়ে।

বাবার অক্ষমতার কথাও জেনেছে সে, তাই মনে মনে নিজেই সাহস অর্জন করতে চায় গৌরী।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় রান্নাঘরের দাওয়ায় খাওয়ার জায়গা

করে দেয় বাড়ির কাজের মেয়েটি। গৌরী বাবার খাবার সাজাচ্ছে।

কথাগুলো ভেবেছে সে।

বাবার একটা ঘি দুধ খাওয়ার অভ্যাস। তখন গ্রামে দুধের অভাব ছিল না। খাঁটি দুধ হতো বাড়িতে। গাইগরুও ছিল কয়েকটা।

ডালে ঘি না পড়লে দেবকণ্ঠবাবুর ডালই খাওয়া হতো না। এখন ওসব চলে গেছে।

আর চারিদিকে নামছে কেবল সমস্যা।

বাবা তাঁর সাধনা নিয়ে ডুবে থাকতে চান, কিন্তু গৌরী আজকের দিনটাকে দেখেছে। গান সেও শিখেছে ভালোই। কিন্তু বুঝেছে আজ গ্রামের অন্ধকারে বসে সাধনা করা যায়, কিন্তু তার প্রচার আর শিল্প কর্ম থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে গেলে তাকে গ্রাম থেকে শহরে, চাই কি কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে শিল্পীর কদর আছে। অর্থ পাবে। বাঁচার পথ পাবে। বাবা যদি সেদিন কলকাতায় গিয়ে থেকে যেতেন আজ গৌরীকেও এতদিন ধরে গান শিখে অর্থের জন্য এভাবে থাকতে হতোনা। শিল্পীর পরিচয় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতো, বাঁচার মত পাথেয়ও পেতো সেখানে। আর সম্মান নিয়ে বাস করতো।

এখানের এই উৎকট এক পরিবেশে তার যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। ভয় হয় গৌরীর। অজানা একটা ভয়!

অভাব অপমান সবকিছু ভয়গুলো এক হয়ে তার সাবধানী নারী মনে একটা আতঙ্কের পরিবেশ আনে।

—অ দিদি! এত কি ভাবছো ?

কাজের মেয়েটার ডাকে চাইল গৌরী।

তারও খেয়াল হয় সত্যিই কি যেন আজে-বাজে ভাবনাগুলো ভিড় করে আসে তার মনে। সেগুলো মন থেকে শক্তহাতে ঝেড়ে ফেলে গৌরী বলে :

—বাবাকে ডাক। খাবার দিয়েছি!

সামান্য আয়োজন! সাধারণ চালের ভাত ডাল একটু ভাজা, একটা তরকারী। শেষপাতে একটা বাটিতে সামান্য দুধ ক'খানা বাতাসা। তাতে ভাত ফেলে দেবকণ্ঠবাবুর নৈশ আহার সমাধা হয়।

এর বেশী আর প্রয়োজন তার নেই। কিন্তু গৌরীর এতে মন ভরে না। তার মনের অতৃপ্তিটা যেন দানা বাঁধে। বঞ্চনা আর অভাব দুটিই ক্রমশঃ তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে।

সাঁইথিয়ার যাত্রার আসর শেষ হতে রাত্রি অনেক হয়ে যায়।

বিপিন অপেরার নামডাক এদিকে দারুণ। কলকাতার নামী দল আর দু'চারজন টপ অভিনেতা অভিনেত্রীও রয়েছে দলে।

যাত্রার দলের জীবনে এসে পড়েছে ললিত নেহাৎ খেয়ালবশেই। কলকাতার সেদিন যাত্রার অভিনয়ে ক্লাবের নাম করা অভিনেতা ছিল সে। তাছাড়া ললিত গান নিয়েই এতকাল কাটিয়েছে। পাইকপাড়া অঞ্চলের পুরোনো বাসিন্দা ললিতের বাবা, কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিক। ব্যবসাতে নামডাকও আছে। অন্যান্য ভাইরা সেই কাজ-কারবার নিয়েই থাকে। বনেদী পরিবার। কিন্তু কলেজে পড়ার সময় থেকেই ললিত অভিনয় গান এসব নিয়ে থাকতো। কোন ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধে গান শিখতো। আর ওস্তাদও ওর সিখায় খুশি হয়ে ললিতকে গান শিখিয়ে ছিল মন দিয়ে। ওদের বাড়ির অনেকের এটা ভালো লাগতো না!

ললিত ওই বংশের ধারা থেকে সরে এসেছে।

প্রথম প্রথম বাবা আপত্তি করে নি। ভেবেছিল এসব সখ দু'চার দিন পরেই মিটে যাবে। ললিত আবার কাজকর্ম শুরু করবে এ বাড়ির অন্য ছেলেদের মতই। তাই চুপ করে ছিলেন তিনি।

কিন্তু তা হয় নি। তাই নিয়েই গোলমালটা দানা বাঁধে এদের বাড়িতে।

কালিদাসবাবুর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই কালিদাসবাবু যেন সংসার থেকে ক্রমশ সরে আসছেন। ব্যবসাতেও প্রচুর রোজকার করেছেন তিনি। এখন সেই বাঁধা পথে রোজকারটা ঠিকই বেড়ে চলেছে।

কালিদাসবাবু বড় ছেলে বসন্তর উপরই এবার কারখানা ব্যবসার ভার দিয়ে নিজে সরে আসতে চান। আর বসন্তও সে ভার নিজেই নিয়েছে।

বসন্তের পরামর্শদাত্রী তার স্ত্রী নিরুপমা।

কালিদাসবাবু দেখেশুনে নিরুপমাকে এবাড়ির বৌ করে এনেছিলেন অনেক আশা নিয়েই। নিরুপমা এসে দেখেছে এদের প্রাচুর্য। শাশুড়ীও ভালো মানুষ।

ছোট দেওর ললিতকে দেখেছে নিরুপমা। নিজের খেয়ালেই থাকে ললিত। শিল্পীমানুষ। এবাড়ির টাকা পয়সা সম্পদের দিকে তার লোভ নেই।

ললিত ওর রেওয়াজ আর অভিনয় নিয়েই থাকে।

কালিদাসবাবু বলেন—এইটাই সবচেয়ে বড় কথা নয় ললিত, আমারও বয়স হচ্ছে। একা বসন্ত কারবার-কারখানা কতদিক সামলাবে? আমার ইচ্ছে এবার এক আধটু করে কায-কর্ম দেখতে সুরু কর। পরীক্ষা দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসাতেই নেমে পড়।

ললিতের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

গান নিয়ে ব্যস্ত। কোন কনফারেন্সে গাইতে যাবে তারই প্রস্তুতি চলেছে। ওদিকে পাড়ার ক্লাবের নাটকের মহড়া চলেছে। সেখানেও ললিতের বড় পার্ট। সেইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

ললিত বাবাকে বলে:

—একটু ঝামেলাগুলো কেটে যাক বাবা। তারপর ঠিক ওইসব নিয়ে থাকবো।

বসন্ত অবশ্য খুব বেশী গরজ দেখায় না।

সে চতুর ব্যবসায়ী। এর মধ্যে নানাভাবে পয়সার সন্ধান সে করেছে। এমনকি অন্ধকার পথের পয়সাটার গন্ধও পেয়েছে। আর তাতেই বদলে গেছে সে!

বাবার কথায় বসন্ত বলে।

—ঠিক আছে। ললিতকে এখন চাপ দিয়ে কি হবে। আমিই দেখছি সব কিছু। ওর ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে যাক। তারপর আসবে ও।

কালিদাসবাবু খুশী হন না।

কারণ, বসন্তের অন্ধকারের কারবারের সন্ধান কিছু পেয়েছেন তিনিও।

আর ললিত যে সেই সব খবর পাক এটা বোধহয় বসন্ত চাইছে না। কালিদাসবাবু বলেন বসন্তকে কি ভেবে।

—দেখো তবে বসন্ত আমি এতদিন সৎপথে থেকে ব্যবসা করে দুটো পয়সা করেছি। আমি চাই না আমার কারখানায় অন্য কেউ—বা, অন্যভাবে চলুক।

বসন্ত বাবার কথায় একটু চমকে উঠলেও সেই ভাবটাকে সামলে নিয়ে বলে—না, না। কোন গড়বড়ই হবে না বাবা!

—নাহলেই ভালো! কালিদাসবাবু মন্তব্য করেন।

দেখেছে ললিত মা মারা যাবার পর এ বাড়ির হাল, বুড়ো চাকর দাশরথিও বুঝেছে সেটা!

ললিতের কাছে কোথায় একটা বুক জোড়া শূন্যতা নেমেছে। এতদিন সে ছিল মায়ের আশ্রয়ে। আজ সেই পায়ের নীচের মাটিটাই সরে গেছে।

সুরও যেন থেমে গেছে তার।

এ বাড়ির কর্তৃত্ব এখন নিরুপমার হাতে! শাশুড়ী নেই—সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে এতসব এসে পড়বে তার হাতে। শাশুড়ীর এত সোনা দানা টাকা সবকিছু।

আর বসন্তও ক্রমশঃ কারখানার সব কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। সেও ভাবতে পারে না যে ললিতকে এসবের ভাগ দিতে হবে।

তাই ললিত এসব থেকে সরে থাকতে যখনই চায়, বসন্তও চাপ দেয় না। আর নিরুপমাও ভাবতে পারে না যে শাশুড়ীর সম্পদে আর কোন ভাগীদার কেউ থাকুক।

দাশরথি বুড়ো এ বাড়ির অনেক দিনের লোক।

সে বুঝেছে বসন্ত আর নিরুপমার মনোভাবটা। তাই বলে সে ললিতকে।

—ললিত, কত্তাবাবুও কারখানা ব্যবসা দেখা ছেড়ে দিলেন, তোদের কি আছে বুঝে নে। চিরকালই কি একভাবে কাটবে তোর?

ললিত হাসে।

ক্রমশঃ মায়ের বিয়োগ বেদনাটা ভুলবার জন্যই ললিত আবার সুরের রাজ্যে ডুবে যেতে চায়। সন্ধ্যার পর যায় সে। ক্লাবে নাটক নিয়ে থাকে।

অন্য জগতের স্বপ্ন দেখে ললিত। কারখানার ওই ইটকাঠের স্বপ্ন নয়, তার জগৎ সুর অভিনয় আর আনন্দে ভরা। টাকা কড়ি প্রডাকশন যন্ত্রপাতি শ্রমিক এসব কঠিন বস্তুর ঠাঁই সেখানে নেই।

ললিত বলে—ওসব বুঝিনি দাশুদা। দাদা দেখছেন তিনিই বুঝবেন। ললিতের কথায় খুশি হয় না দাশরথি। বলে সে—তোর ভালোর জন্যই বলছি রে!

ললিত হাসে।

দাশরথি বলে—হাসিস না! পরে পস্তাবি।

কর্তাবাবুর ডাকে নেমে যেতে হল দাশরথিকে।

ইদানীং কালিদাসবাবু ললিতকে বিশেষ কিছু আর বলেন না। মনে হয় যে যা ভালো বোঝে করুক। তাই দাশরথিকে শুধোয়:

—কি বলছিলি ললিতকে ?

দাশরথি গজগজ করে—বলছিলাম আমার মাথা আর মুণ্ডু!

কালিদাসবাবু বৌমার ডাকে চাইলেন।

নিরুপমা এসেছে এখানে। সে যেন এর মধ্যেই বদলে গেছে। তাই দাশরথি যে ললিতকে ওসব কথা বলে সেটা অনুমান করতে দেরী হয় না। নিরুপমা দাশরথিকে ঠিক সহ্য করতে পারেনা। তাই ছুতোয়-নাতায় রাগটাই প্রকাশ করে অন্য পথে।

আজ কালিদাসবাবুর এখনও স্নান হয়নি দেখে নিরুপমা বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বলে।

—কি করো সারাদিন দাশুদা, বাবার স্নান হয় নি। খাবেন কখন ? অকাজ না করে কাজের কাজগুলো সময় মত করো দিকি! যাও চান-এর ব্যবস্থা করোগে।

দাশরথি কালিদাসবাবু দুজনেই ওই কণ্ঠস্বরে অবাক হয়। কালিদাসবাবু বলেন—আমি স্নান করছি মা। তুমি যাও।

ললিতও বৌদির দিকে চাইল।

নিরুপমা বলে—তাহলে বাবাকে বলি ঠাকুরপো, আমার মাসতুতো বোন বলেই নয়, রমা সেবী মেয়ে। রং একটু কালো আর একটা চোখ একটু গড়বড়ে। তাহলে কী আছে।

ললিত একটু অবাক হয়।

তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লেগেছে বৌদি।

ললিত বলে—বিয়ে কি করবো বৌদি! এখনও নিজে রোজকার করিনা। একটু থিতু হতে দাও।

নিরুপমা বলে—ওসব হবে। তোমার দাদারও অমত নেই। বিয়ে থা করে এবার দাদার কাজে লেগে যাও। মাসে হাজার খানেক করে টাকা মাইনে করে দেব।

নিরুপমাই যেন সবকিছুর মালিক। আর কারখানা ব্যবসা সবই যেন বসন্তবাবুরই। দয়া করে ওরা তাকে চাকরী দেবে, ওই হাবা কানা কালো কুৎসিত মেয়েটাকে উদ্ধার করার জন্য। ললিত বলে।

—ওসবে আমি নেই বৌদি। বাবা দাদাদের ভাবতে বলো। আর এখন আমি ব্যস্ত। কনফারেন্সে গাইতে যেতে হবে এলাহাবাদে। ফিরে এসেছে নাট্যোৎসব। সময় কই ওসব করার।

নিরুপমা ওসব কথা শুনে খুশী হতে পারে না। তার মনে মনে এবাড়ির সবকিছুর উপর দখলদারির নেশা পড়ে গেছে। ওই কানা মেয়েটাকে গছিয়ে সেও ললিতকে যেন বঞ্চিত করতে চায় অনেক কিছু থেকে।

চাকরী দিয়ে কৃতজ্ঞ করে রাখতে চায়।

কথাটা শুনে কালিদাসবাবুও খুশী হন না।

দাশরথিও রয়েছে। নিরুপমার কথাটা শুনে কাযের পরিচয় আর বর্ণনা দিতে কালিদাসবাবু বলেন।

—না, না! এ হয় না বৌমা! ললিত কি আমার যে সে ছেলে! আর দেখতেও সে সুন্দর। তার সঙ্গে ওই মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। তাছাড়া নিজেদের চেনা জানা আত্মীয়দের মধ্যে করণ কারণ না করাই ভালো।

নিরুপমা গম্ভীর হয়ে ওঠে!

চটে উঠেছে সে। দাশরথি বলে।

—ঠিক বলেছেন কর্তাবাবু, ললিত দেখতে রাজপুত্রের মত—তার ঘাড়ে কালো—কানা মেয়ে চাপাবে কেন!

নিরুপমা এবার আর রাগটাকে চাপতে পারে না। বলে সে।

—না ছোটবাবু, ওই পলাশফুলই। বর্ণই সার! আর এবাড়ির চাকরই দেখছি সব।

কালিদাসবাবু অস্ফুট স্বরে বলেন।

—কাকে কি বলছো বৌমা! দাশরথি চাকরই নয়। এবাড়িরই একজন সে। মনে রেখো!

নিরুপমা কথাটা শোনার বা কোন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনই বোধ করে না। তাই চলে গেল সে!

ললিতকে বোকা সাজিয়ে সবকিছুর দখল পাবার বাসনাটা ব্যর্থ হয়ে যেতে নিরুপমাও এইবার ফুঁসে ওঠে। ছুতায়-নাতায় এবার দাশরথিকেই নয় তার শ্বশুরকেও শোনায়।

—একা এসব বইতে আমি পারবো না। দাসীগিরি করতে এখানে আসিনি।

কথাটা ললিতও শোনে।

বলে সে—কি বলছো এসব বৌদি!

নিরুপমা ফুঁসে ওঠে—ঠিকই বলছি! আর যে যার নিজের পথ দেখে নিক। আমরা দুজনই যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। কেন? তোমার দাদার ঘাড়ে উনি চাপিয়েছেন ব্যবসার সব ভার। আর আমার ঘাড়ে চেপেছে সংসার। বাকী এ বাড়ির সবাই বসে বসে তাদের রোজকারে খাবেন আর মজা দেখবেন।

ললিত চুপ করে যায়।

নিজের অক্ষমতার কথা সে জানে। ওই ব্যবসা কারবার কারখানা তার ভালো লাগে না। দু'একদিন গিয়ে সব দেখেশুনে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। বেশ বুঝেছে তাকে দিয়ে ওইসব হবে না।

ললিত তাই বৌদির কথায় বলে।

—আমিই এ সংসারে বেকার রয়েছি। তবে তোমাদের অসুবিধা

হয় আমিই সরে যাবো বৌদি। তোমাদের বোঝা হয়ে কখনই থাকবো না।

ললিত চলে যাক, সবকিছু ফেলে দিয়ে সরে যাক, এ কামনা নিরুপমা অনেক দিন থেকেই করেছে। আজ ললিতকে ওইভাবে চলে যাবার কথা বলতে সেও মনে মনে খুশীই হয়। তবু একটু ন্যাকামি করে বলে নিরুপমা।

—আমি কি সেই কথা বলেছি ঠাকুরপো, এতো তোমারও বাড়ি। আমি পর বই কেউই নই। আমি একথা বলার কে! কথাটা বলছিল তোমার দাদা।

ললিতের কাছে এই পরিবেশ যেন বিশ্রী লাগে। তার মন বিষিয়ে উঠেছে।

সামনে কনফারেন্স, গাইতে হবে। ললিত তাই নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে ওইসব গোলমাল থেকে।

কালিদাসবাবুও শুনেছেন কথাগুলো।

নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছেন তিনি। তাই অন্যের নীচতা লোভগুলোকে চিনতে দেরী হয় না। কারণ মানুষ চেনেন তিনি। ক্রমশঃ দেখেছেন এ বাড়িতে তার বড় ছেলে আর বৌমার সমবেত চেষ্টাটা। কি করে সবকিছুতেই নিজেদের দখল কায়েম করবে সেই চেষ্টাই করে চলেছে তারা। তাই কালিদাসবাবুও ঠিক করেছেন এ বাড়ি থেকে লেকের ধারে তাঁর নোতুন বাড়িতেই চলে যাবেন। নিজে সেখানে বাড়ি করেছেন। এবার এদিক থেকে চলেই যাবেন। দাশরথিও বলে।

—তাই চলুন কর্তাবাবু। ওদিকে খোলামেলা গাছগাছালি আছে। নিরিবিলিতে থাকবেন।

কালিদাসবাবু বলেন—তাই চলে যেতে হবে রে। ললিতের একটা ব্যবস্থা করেই চলে যাবো।

ললিত ভাবতে পারেনি যে ব্যাপারটা এমনিভাবে ঘোরালো হয়ে উঠবে। সে এলাহাবাদ কনফারেন্স থেকে গান করে ফিরছে। মেজাজটা খুবই ভালো রয়েছে। এবার নাম করেছে সে। আর এরপরই পড়তে হবে ক'দিন নাট্য সম্মেলন নিয়ে।

বাড়িতে ঢুকেই একটু অবাক হয়।

আবহাওয়া কেমন থমথমে। দাশরথির সঙ্গে দেখা হতে সে বলে।

—সে সব পরে শুনবি। অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে।

অবাক হয় ললিত—এত ব্যাপার কি হ'ল দাশুদা ?

দাশরথিও কিছুটা আভাস দেয়। বড় বৌ বড় ছেলে নাকি বাবার কি কথায় খুব রেগে উঠেছে। আর বাবাকেও দুচার কথা শুনিয়ে দিয়েছে বসন্ত।

—সেকি !

ললিত চমকে ওঠে। দাদাও এমনিভাবে বদলে যাবে ভাবেনি। বিষয় আর অর্থ এই নিয়েই মানুষ যে এভাবে বদলে যেতে পারে ভাবেনি ললিত।

কালিদাসবাবুর ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে গিয়ে ললিত অবাক হয়। গুম হয়ে বসে আছেন কালিদাসবাবু। ললিত বাবাকে দেখে বলে—শরীর খারাপ নাকি বাবা ?

কালিদাসবাবু বলেন।

—না, শরীর ঠিকই আছে। এবার তুমি নিজের ব্যবসাপত্র আমি থাকতে থাকতে বুঝে নাও ললিত। আমারও কর্তব্য তোমার যা কিছু তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া।

ললিত অবাক হয়।

—এসব কি বলছেন বাবা !

বাবা বলেন—ঠিকই বলছি। আজ সন্ধ্যা বেলায় বেরিয়ো না। বসন্তকেও থাকতে বলেছি। একটা মীমাংসা করে আমি নিশ্চিন্ত

হতে চাই। তারপরই এবাড়ি থেকে আমি লেক গার্ডেনস্‌-এর নোতুন বাড়িতে চলে যাবো। শান্তিতে থাকতে চাই সেখানে।

ললিতের মন বিষিয়ে উঠেছে।

সেও দেখেছে দাদা বৌদির অনেক ব্যাপার। আর যাই হোক তার জন্যই বাবাও শেষ বয়সে যেন কষ্ট পাচ্ছেন দুশ্চিন্তায় ভুগে ভুগে। আর সেই ভাবনা অপমান যে কতখানি তীব্র সেটা বুঝেছে সে।

ততই মন বিষিয়ে উঠেছে ললিতের।

এবাড়ির পরিবেশও তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

সেটা আরও তীব্রতর হয় আজকের সন্ধ্যায়।

বসন্ত আর নিরুপমা দুজনেই তৈরী হয়ে এসেছে আজ। কালিদাস-বাবু বলেন—ললিতের অংশ রয়েছে, তাকেও পার্টনার করে দিতে চাই কারখানার, আর তাকে মাসে মাসে এবার পাঁচশো টাকা করে হাত খরচা দিতে হবে।

বসন্ত স্ত্রীর পরামর্শে চলে। এতদিন নিজেরাই সব দখল করেছে। আজ পার্টনারশিপের কথা উঠতে বসন্ত জবাব দেয়—আপনার ব্যবসার ভার দিয়েছেন আমার উপর। আমার যা ভালো বোধ হয় করতে দিন। ললিতের হাতে ব্যবসা পড়লে সেই-ই শেষ করে দেবে।

আর হাতখরচা তাকে দিতে পারি, তাকেও অফিসে কায করতে হবে। মাইনে বাবদ দেব।

কালিদাসবাবু চাইলেন ছেলের দিকে।

ললিত বলে ওঠে—ওসব কথা থাক বাবা। আমার জন্য ভাবতে হবেনা! আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব।

কালিদাসবাবু বলে ওঠেন—থাকবে কেন! তোমারও যা আছে বুঝিয়ে দিতে চাই। আর বড় বৌমা, তোমার শাশুড়ীর গহনাপত্র একা তোমারই নয়। সব ফর্দ আমার কাছে আছে। তার থেকে ললিতের অংশ আলাদা করে লকারে রেখে দিতে চাই।

নিরুপমা চমকে ওঠে। বলে সে—

—আমাকে অবিশ্বাস করছেন বাবা?

কালিদাসবাবু বলেন—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়, ও বাড়িতে চলে যাবার আগে এসব মীমাংসা করে যেতে চাই। যাতে তোমাদের ব্যাপারে আর না আসতে হয়।

বসন্ত এবার গর্জে ওঠে।

—অর্থাৎ আপনি আমাকে ওকে দু'জনকে অবিশ্বাস করছেন। সবচেয়ে বড় হ'ল ললিত! আর আমি দিনরাত্রি পরিশ্রম করে এই সব বজায় রেখেছি তার দাম নেই?

ললিতও এসব চায়নি। তার দরকার সামান্যই। তাই সে চায় না তাকে কেন্দ্র করে তাদের সংসারে এমনি অশান্তি নামুক। ললিত বলে—এসব কি করছেন বাবা?

বসন্ত শোনায়—বাবার ভীমরতি ধরেছে!

ললিত দাদা বৌদির ব্যবহারও দেখেছে, বোঝে সে সবই। আজ দাদাকে এভাবে কথা বলতে দেখে শোনায়।

—দাদা। একি বলছো? তোমাদেরও নোংরামীর শেষ নেই? বাবাকে এই সব কথা বলো টাকার লোভে অন্ধ হয়ে? ছিঃ! ছিঃ!

নিরুপমা তীক্ষ্মস্বরে বলে উঠে।

—তা আর বলবে না তুমি? নিজে কি তা জানি! বাবাকে বলে বলে এইসব পরামর্শ দিয়ে সংসার ভাঙ্গতে চাও। গান নাচ থিয়েটরের মেয়েদের নিয়ে হুল্লোড় করতে হবে, টাকার দরকার তাই এইসব মতলব ধরেছো। আমরাও দেখে নেব।

—বৌদি! ললিতের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। বলে সে:

—এসব কথা বলোনা তুমি। যা সত্যি নয়, সেগুলোকে এত সহজে উচ্চারণ করতে পারো এ জানা ছিল না; আর জেনেরাখো এই

সম্পত্তিতে আমার কানাকড়িও লোভ নেই! তোমরা এরজন্য বাবাকেও অপমান করতে পারো, আমাকে তো করবেই।

ললিত উঠে বের হয়ে গেল।

কালিদাসবাবুও অবাক হন। নিরুপমা তখনও বেশ চড়াস্বরে বলে—আবার মেজাজ আছে! এসব চাই না! যাও—নিজে রোজকার করে নিজেরটা চালাও তবে বুঝবো মরদ! দাদার কাছে হাত পাততে লজ্জা করে না?

কালিদাসবাবু ধমকে ওঠেন।

—থামো বৌমা! এসব কথা আর নাই বললে? সে ভিক্ষে করে না। তার জিনিস থেকেই সে নেয়। এসব আমার, আমিই সেই ব্যবস্থাই করবো।

ললিত পরদিনই ওবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। আর নামকরা যাত্রার দলেই যোগ দিয়েছিল। যা পাবে তাতে তার একজনের ভালোই চলবে। আর কি একটা ঘৃণা নিয়েই যেন কলকাতা থেকে যেতে চেয়েছিল সে।

তাই চলে এসেছিল। বাবাকেও সব খবর দেয়নি। শুধু ঠিকানা-বিহীন চিঠি দিয়ে কুশল সংবাদ দিয়েছে। আর বাংলার শ্রমজীবনে এসে মিশেছে। যাত্রার দলের জীবনের সঙ্গে সেও মিশে গেছে। ভালোই লাগে এই যাযাবর বৃত্তিটাকে। আজ এখানে কাল সেখানে ওই দিন-ভোর পথে পথে বাসএ কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে কোন আসরে এসে নেমে পড়ে। সে তখন অন্য এক সত্ত্বা। নাম-পরিচয়েও সেই চরিত্রের ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

বিপিন ঘোষাল নিজে দল পরিচালনা করে। জানে এসব ব্যাপারে নিজে না থাকলে ম্যানেজারই সব ফৌত করে দেবে। নায়ক পক্ষ

পুরো টাকা মিটিয়ে দিলেও অনাদায় খাতে দেখিয়ে নিজে পকেটস্থ করবে টাকাটা। তাছাড়া গান-এর মানও খারাপ হয়ে যাবে নিজে না থাকলে। বদনাম হলে ব্যবসা চলবে না। বিপিন ঘোষাল সেটা চায় না।

তাই বিপিন ঘোষাল নিজেই রয়েছে দলের সঙ্গে। চারিদিকেই নজর তার।

রাতের বেলায় যাত্রার দলের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। ঠাকুর চাকর থাকে বটে, তারা দিনে আগাম আসরের জায়গায় গিয়ে খাবার তৈরী করে রাখে। দিনে কোম্পানীর খরচায় খাওয়া-দাওয়া হয়। রাতে কোম্পানী সকলকে জলপানি ধরে দেয় হিসাব মত নগদপয়সায়।

দলের তিন-চারজন একত্রে নিজেদের কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। অনেকেই বাইরের দোকান থেকে পাঁউরুটি মুড়ি যা পায় তাই দিয়ে খাওয়ার পালা সেরে নেয় কোনরকমে। তারপর শুরু হয় বাস নিয়ে ছোটা। এক আসর থেকে অন্য আসরে ছুটতে হয় গানের পরই।

বিছানাপত্র, সাজের বাক্স যন্ত্রপাতি তোলা হয়েছে গাড়িতে। আজ বিপিন ঘোষালের মেজাজটা ভালো নেই।

নায়িকা ধীরা পাল বেশ কড়া কথা শুনিয়েছে তাকে। আর ধীরা এ দলের টপ্। ধীরার পিছনে রয়েছে বিজিত কুমারও। বিপিন ঘোষালের নজর এড়ায় না কিছুই। ইদানীং দেখেছে বিপিন ঘোষাল, ধীরা আর বিজিতবাবু বেশ বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। তাদের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখে বিপিন; কিন্তু তাতেও খুশী নয় ওরা। দল চলে তাদের নামে। সেটা তারা জানে, তাই আরও পেতে চায় সকলকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া ইদানীং দুজনের মধ্যে একটু বেশী মাখোমাখো ভাবটা সকলেরই নজরে পড়ে।

যাত্রা দলের যাযাবর জীবনেও হয়তো প্রেমের যাদু মাঝে মাঝে ভেল্‌কী হয়ে ওঠে। এক মরশুমে দুজনের মধ্যে প্রেম হল, পরের মরশুমে

দুজন দুদলে, ফলে সে-সব প্রেমের ধোঁয়াও ফানুস হয়ে মিলিয়ে যায়। তবু এসব চলে।

ধীরাকে আজ আসরে ললিত বেশ বেকায়দায় ফেলেছিল। ললিতের বন্দেজী গলা, তার তান লয় অনেক কড়া। ধীরা গাইছে—দুজনের মাঝে পাল্লা হবে, এমনি সিনটা। আর তার বিচারক নিজে মহারাজা কন্দর্পকান্তি। কোলরাজ্যের অধিপতি।

কন্দর্পকান্তির ভূমিকা করছে বিজিত কুমার। ললিত এই ভ্রাম্যমান জীবনে এসে পড়েছিল, কিন্তু এখানে এসে দেখেছে ওদের সাম্রাজ্য।

ললিত অন্য সমাজের মানুষ। যাত্রার জগতে এসে এই বিজিত কুমার, ধীরাদের মত অভিনেতা গাইয়ের দাপট যা দেখেছে তাতে অবাক হয়েছিল!

ইচ্ছে করেই আজ ধীরাকে সে একটা বিপদেই ফেলে একটু শিক্ষা দিতে চায়। কারণ মেয়েটা দাম্ভিক, গান তেমন জানে না, অথচ জাহির করে। আর নীচু থাকের শিল্পীদের মানুষই মনে করতে চায় না।

ললিত অবশ্য নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলে। বিজিত কুমার-ও মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে সমীহ করে ললিতকে। ভয় হয়। কারণ চেহারা আছে, আর গায়ও অপূর্ব। অভিনয় বোঝে! যে কোনদিন ইচ্ছে করলে ও বিজিত কুমারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সেদিন আবার ধীরার সঙ্গে পাল্লা চলেছে। হারতে হবে তাকে। তবু বিজিত ইচ্ছে করেই আজ সেই ভরাটি রেওয়াজি গলায় দুরূহ লয়—অপূর্ব মীড় তুলেছে। বাহবা করে আসর। ধীরাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব।

বিজিতও।

তাই ওরা দুজনেই রেগে উঠেছে। কালরাজ শেষকালে তুচ্ছ

কারণেই সেদিন সভা বন্ধ করে দেন—নাটকের সিনে না থাকলেও। আর ধীরাকেই দেন পুরস্কার। আদেশ দেন দুর্বিণীত ওই ললিতরূপী শিল্পীকে পদাঘাত করে রাজ্য থেকে বার করে দিতে।

কোনরকমে শেষরক্ষা হয় কিন্তু গ্রীনরুমে ঢুকে বিজিত কুমার ধীরার মত টপ শিল্পী দুজন বিপিন ঘোষালকে ফুঁসে ওঠে।

—এপালা চলবে না, হয় পালা বদলাও না হয় ওই ললিতের মত কালোয়ারকে তাড়াও। অবাধ্য অসভ্য লোক! দলের অনেকেই ললিত যে ধীরাকে অপদস্থ করেছে এটাতে খুশীই হয়েছে। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না। বিপিন ঘোষাল চতুর ব্যক্তি, সে দল চালাচ্ছে বেশ কিছু দিন ধরে। জানে এসব কি করে সামাল দিতে হয়। গানের পর দুটো বড় বোতল মুরগীর মাংস বিজিতবাবুর ওখানে পাঠিয়ে নিজে খুব কিছুটা ফাঁকা আওয়াজ করে—দলে বেআইনী সইব না। আমি কড়া লোক। এর ব্যবস্থা করবোই।

দলের অন্যরা আজ খুশী হয়েছে বিজিত ধীরাকে একটু ঘা খেতে দেখে। ললিত অবশ্য এটা নিয়ে কোন গুরুত্বই দিতে চায়নি।

দলের মধ্যে মালিকও এই ভেদনীতি বৈষম্যটা যেন টিকিয়ে রেখেছে।

ধীরা বিজিতবাবুর জন্য সবই আলাদা ব্যবস্থা। ওরা দলের সকলের চেয়ে বড়। শুধু বড়ই নয়—তাদের তোয়াজ করতে বিপিনবাবু ব্যস্ত, ফলে অন্যদের কথা ভাবার সময়ও নেই।

ওদের জন্য দাদখানি চালের অন্ন, ঘি কাগজিলেবু, দু'তিন রকম তরকারী, রুই মাছের মাথা, মুরগী, সন্দেশ সব আনতেই হবে, চারটে বাটি সাজিয়ে নিজেদের ঘরে খাবার যাবে। চাকরও আলাদা।

সেদিন দলের কে একজন একটা পিঁয়াজ চেয়েছে, বিপিনবাবু ফুঁসিয়ে ওঠে।

আবার কাগজী পিঁয়াজ, একি শ্বশুরালয় পেয়েছো ? যা দিচ্ছি তাই গেলো। আর কিছু হবে না।

ললিত বলে ওঠে—ওদের জন্য এত করেন, ও পিঁয়াজ চাইলেই দোষ ?

কথাটা ধীরার কানে যেতে সেও ফুঁসে ওঠে—মুড়ি মিছরির যদি একদর করেন বিপিনবাবু, তাহলে তো আমার থাকা যাবে না।

বিজিত কুমারও বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে জানায়।

কথাটা আমিও ভাবছি ঘোষাল মশাই। সৌখীন অভিনেতাদের বাড়ও বেড়েছে। তাই বলছিলাম, আমাদের ছুটি করে দিয়ে ওদের নিয়ে দল চালান।

বিপিনবাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। ভরা মরশুম—এখন এসব গোলমাল হলে ভরাডুবিই হবে। বিজিত ধীরার নামেই বুকিং। ওই ললিত ছোকরা ভালো গায় এক্টোও করে। তবু তাকেই সরিয়ে দিলে কোন গাইয়ে দলছুট অভিনেতা চিৎপুরের বাজারে মিলে যাবে। ছোকরার এলেম আছে। চেহারাখানাও সুন্দর, গলাও চমৎকার, কিন্তু দোষ ওই মেজাজের। বিপিন ঘোষাল সব ভেবেচিন্তে বিজিতবাবুকে ধীরাকে বলে।

—আপনারা শান্ত হোন। এসব কথা আর উঠবে না।

...ললিতকে বৈকালে ডেকেছে বিপিনবাবু। খাওয়া-দাওয়ার পর অবকাশ মিলতেই যাত্রার দলের ক্লান্ত লোকগুলো ঘুমে ঢলে পড়েছে। ওরা সন্ধ্যাতক পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

এই ফাঁকে বিপিন ললিতকে ডেকে এনে তার ঘরে বসিয়ে বলে।

—কাজ করার বাসনা আছে যাত্রার দলে ললিতবাবু ?

ললিত জানে রেগে গেলে বিপিনবাবু মাঝে মাঝে সাধু ভাষা প্রয়োগ করে, ওতে নাকি ফিলিংসটা বেশ জোরদার করে প্রকাশ করা যায়। ললিত জানে আজ ধীরা বিজিতবাবুরা নাকি

বিপিনবাবুকেও শাসিয়েছে। ললিত সব জেনেই বিনীতভাবে বলে—আমার বাসনার অভাব কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে? কি ঘোষাল মশাই?

বিপিন ঘোষাল গম্ভীর হয়ে বলে—পূর্ণমাত্রায়, তাই বলছিলাম গুণ থাকলেই হয় না, ওরাও মস্ত গুণী অভিনেতা—ধীরার গান তো নামকরা, ওদের কাছে কিছু শিখে নাও, মেজাজ দেখিয়ো না। বড় হতে পারলে তুমিও চারটেবাটি—আলাদা চাকর পাবে দলে। বুঝলে?

ললিত হেসে ফেলে।

—চারটে বাটির পজিসন আমি চাই না ঘোষাল মশাই। তবে শেখার কথা বলেন যদি, কিছু শেখাতে পারেন শিখবো।

সাঁইথিয়ার আসরে বিজিতবাবু ধীরা অভিনয় শেষ করে মেক-আপ তুলে নিজেদের গাড়িতে করে রওনা দিয়েছে দেবগ্রামের দিকে। এরা বাস-এ উঠে রওনা দিতে দিতে রাত্রি ভোর হয়ে আসে।

ললিত গুম হয়ে বসে আছে। আজ দেখেছে আসরে ধীরা তাকে তিরস্কার করার ডায়ালগ-এর জায়গায় নিজেই বানিয়ে বলেছিল।

পদাঘাত করে দূর করে দেবো। এ নিয়ে অনেকেই বেশ চটে উঠেছে। অবশ্য ললিত বলে—আসরে কোণঠাসা করেছি। একটু ছটফট করে যা তা বলে ফেলেছে।

কে বলে—না। ওটা এমনিই। সবাইকে অপমান করে।

রমেশ ভট্টাচার্য যাত্রার দলের পুরোনো অভিনেতা। কোনমতে এদল ওদল করে এতগুলো বছর পার করেছে সে। এক বছরেই ললিতের সংস্পর্শে এসে রমেশ চিনেছে তাকে। বুঝেছে ললিতের এখানে অপমান সহ্য করে থাকার কোন কারণ নেই।

হয়তো আজই ললিত চলে যেতো, কিন্তু ললিত বসে রমেশের কথায়—ঘোষাল মশাই ওনার কাছে কিছু শিখতে বলেছেন, তাই রয়ে গেলাম এখনও।

রমেশ বলে—এখানে থাকার কি খুব বেশী দরকার তোমার? গানের বাজারে তোমার নাম আছে ললিত। তবে কেন পড়ে আছো এখানে?

হাসল ললিত।

বাসটা চলেছে আবার অন্য আসরের দিকে। দেবগ্রামে ওদের দু'রাত্রির অভিনয়। দুটো বই হবে। তবু দলের অনেকেই নিশ্চিন্ত হয়। দু'দিন পুরো বিশ্রাম পাবে তারা, ঘুমুতে পারবে, ওটা তাদের খুবই দরকার। তাই খুশীমনেই দেবগ্রামে চলেছে তারা।

ললিতের প্রথম নজরেই জায়গাটাকে ভালো লেগে যায়। সভ্যজগৎ থেকে দূরে নির্জন সবুজের মাঝে গ্রামটা একটা ঐতিহ্য নিয়ে নিজের মাঝেই সমাহিত শান্ত সুন্দর। ময়ূরাক্ষী নদী এই সবুজ গ্রামটাকে হাঁসুলিবাঁকের মত দুদিক ছুঁয়ে বয়ে গেছে, শীতের শেষ। এখনও হাঁটুভোর জলধারা বয়ে চলেছে বালুচরের একদিকে।

দেবগ্রামে ওদের থাকার জায়গা হয়েছে ওই জমিদার বাড়ির একটা কাছারি ঘরে। এখন কাছারি আর বসে না। শূন্য। সামনে বাগান ছিল এককালে। এখনও দীঘির ঘাটটা বাঁধানো—বকুল গুলঞ্চ দু'চারটে ফুলের গাছ—পামগাছ পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, মেহগিনী গাছও রয়েছে কয়েকটা। আর সবচেয়ে ভালো লাগে ললিতের —জায়গাটা বেশ নিরিবিলি শান্ত আর সবুজ।

সকালে এসেছে তারা এখানে। একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান সেরে ললিত একাই বের হয়েছে, গ্রামটা দেখতে। কলকাতার ইটকাঠের জগতে মানুষ হয়েছে; কিন্তু তার বার বার মনে হয়েছে যে ওই জগতে মানুষ বাঁচতে পারে না চিরকালের জন্য। তার জন্য মাটি গাছ নদী ফুল এসবের প্রয়োজন আছে। শান্তি চায় প্রতিটি মানুষই।

দেবগ্রামের শান্ত পরিবেশে সে একাই চলেছে। ওদিকে বাজার আড়ত হাটও রয়েছে। দূরপল্লীর বুকেও এখানে বেশ

সমৃদ্ধির ছাপ দেখা যায়। অতীতে ছিল জমিদার প্রধান অঞ্চল। এখন তারা নেই ; কিন্তু সেই অঞ্চল অন্য সমাজের হাতে গিয়ে জমেছে। তাই রূপ বদলেছে আজকের গ্রামের। এই দিকটা এখন জ াঁকালো। বড় গুদাম-এর সামনে কয়েকটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কে জিপ নিয়ে এসে থামলো সেখানে। কুলিদের উদ্দেশ্যে চেঁচামেচি গালাগালি করে আবার জিপ নিয়ে বের হয়ে গেল সে। ওদিকে দেখা যায় লোহালক্কড় সিমেণ্টের গুদাম। বড় বড় দোকান, আদক এণ্ড কোম্পানী, লোকজন কাজ করছে, ওদিকে ধানকল চলার শব্দ ওঠে।

সব মিলিয়ে গ্রামের অর্থনৈতিক দিকটার একটা ছবিও ফুটে ওঠে ললিতের চোখের সামনে।

...বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথ দিয়ে চলেছে। দুদিকে বাঁশবন-মাদার গাছে ফুল ফুটেছে। আমগাছগুলোর বোলের গন্ধে বাতাস এখানে ভারি ভারি ঠেকে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ললিত।

...ছায়াঘন বাড়ির থেকে একটা সুর ভেসে আসে। টোড়ির শুদ্ধ সুর। একটি মেয়ের সুরে সুর মিশেছে একটি প্রবীণের সাধা গলার সুর।

শান্ত ফুলফোটা জগতে ওই শুদ্ধ টোড়ির সুরটা খুব চেনা। আর প্রতিটি পর্দা এসে লাগছে—রাগরূপ ফুটে ওঠে সুন্দরতর রূপে।

ললিত পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ওই শান্ত সুরময় জগতের দিকে। তার নিজের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সেও এমনি রেওয়াজ করতো। মনের গহনে নামতো কি নিবিড় প্রশান্তি।

আজ সেই জীবন থেকে সে সরে গিয়ে যাত্রার দলে সং সেজে আর গানের সস্তা পশরা নিয়ে চলেছে হাটে বাজারে। ওই মেকি এক অভিনেত্রীর কাছে অপমানিত হয়েও দলে পড়ে আছে ললিত, কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে। এখন বেশ বুঝেছে ললিত।

ওখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই, আশা নেই। এপথ আর ভালো লাগে না।

...বিপিন ঘোষালের কথাগুলো মনে পড়ে—মাথা নীচু করে থাকতে হবে বাপধন, না'লে যাত্রার দলের অন্ন অদৃষ্টে জুটবে না।

হাসে ললিত। বাড়ি থেকে জোর করে পালিয়ে এসেছে সে। নাহলে ওই জিনিসটার অভাব তার কোন দিনই নেই। কিন্তু কি এক দুরন্ত খেয়ালেই ললিত যেন তার নিজের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। আসল সাধনাকেই ভুলে গেছে। ওই সুরটি ললিতের মনে ঝড় তুলেছে। থমকে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে ললিত এই আলাপটা। এখানে ওই ঘরানার গান শুনতে পাবে ভাবেনি।

—'কদম কি ছাঁওমে' সুরটা উঠছে এই নিভৃত শান্ত জগতে। কদমবনের ছায়াঘন জগতে ফুলফোটা স্নিগ্ধ বাতাসে ওই সুরটা যেন হারিয়ে যায়।

ধৈবত গান্ধার ছুঁয়ে সুরটা উঠছে—

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না, হঠাৎ কাকে দেখে চাইল ললিত। খেয়াল হয় সুরটা থেমে গেছে। কার ডাকে চাইল সে, একটি প্রবীণ লোক তাকে দেখছে। সুন্দর ফর্সা চেহারা—মুখে-চোখে মিষ্টি একটা ছাপ। শুধালেন তিনি।

—গান শুনছিলে ?

ভদ্রলোকের প্রশ্নে ললিত একটু লজ্জিত বোধ করে। যেন চুরি করে এসে সে ওদের সুরের জগতে প্রবেশ করেছিল। তাই সলজ্জভাবে বলে। মাফ্ করবেন। সুরটা কানে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। এখানে এমনি গান শুনে অবাক হয়েছি। এ গান শুনেছিলাম পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গলায়—সেই স্বরগ্রাম সেই পর্দা ছুঁয়ে পঞ্চমে ওঠার ঢং আর মেজাজ এখানে পাবো—ভাবি নি।

দেবকণ্ঠ দেখছে তরুণটিকে। ওর কথায় খুশী হয়েছে মনে মনে।

ছেলেটি গানের সমঝদার। দেবকণ্ঠবাবু ওকে এখানে এর আগে দেখে নি।

তাই শুধোয়—এখানে নোতুন এসেছো ?

মাথা নাড়ে ললিত।

দেবকণ্ঠবাবু বলে—দেবগ্রামের নাম ছিল এককালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্র। কিশোরী মোহন ভট্টাচার্য, হরনাথ ভট্টাচার্য এরা তো কলকাতাতে গাইতেন, এখানের গানে গোয়ালিয়র ঘরানার আর ভাতখণ্ডের ঘরানার ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। এখন অবশ্য সব হারিয়ে গেছে।

ললিত দীর্ঘদিন ক্লাসিকের চর্চা করেছে। তাই ওই গাইয়েদের নামও শুনেছে। আর তারা যে এই গ্রামেরই লোক তা জানতো না। তাছাড়া আজ এর গান শুনেও অবাক হয়েছে ললিত। সুর পঞ্চমকে ওই ভাবে ব্যস্ত করা—আন্দোলিত সুরকে ওই রূপ দিয়ে বিস্তার করার মত গুণী শিল্পী কলকাতাতেও কম দেখেছে সে।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে একটি মেয়ে।

—বেলা হয়ে গেছে। স্নান খাওয়া করবে না বাবা ?

ললিত ওর দিকে চাইল। সাদামাটা শাড়িতে ওই মেয়েটিকে মানিয়েছে চমৎকার।

ওর দেহ ঘিরে একটি শ্যামস্নিগ্ধ রূপ ফুটে উঠেছে। ললিত বলে দেবকণ্ঠবাবুকে।

—আমি আসি।

হঠাৎ কি ভেবে ললিত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে সরু পথটা দিয়ে চলে গেল।

গৌরী ব্যাপারটা দেখেছে। ওই সুন্দর তরুণটি তার বাবাকে প্রণাম করে চলে যেতে গৌরী এগিয়ে এসে শুধোয়—ও কে বাবা ?

দেবকণ্ঠবাবু ওর কথাগুলো ভাবছিলেন। ছেলেটি গান-এর কিছু

বোঝে, আর ওর প্রণামের ভঙ্গীটি বড় ভালো লেগেছে। দেবকণ্ঠবাবু দেখেছেন ছেলেটির মুখে বুদ্ধি আর মার্জিত রুচির ছাপ। গৌরীর প্রশ্নে চাইল মেয়ের দিকে। মনে হয় ছেলেটির কোন পরিচয়ও নেওয়া হয় নি।

তাই গৌরীর প্রশ্নে জানায়।

—ওই ছেলেটি ? ওর কোন পরিচয় তো জানি না মা। পথ দিয়ে যাচ্ছিল, গান শুনে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে মনে হ'ল গান বাজনার খবর ও জানে। এখানে নোতুন এসেছে বললে।

গৌরী একটু অবাক হয়। আজকাল অজ পাড়াগ্রামেও সরকারের রকমারি অফিস গজিয়েছে, বাইরে থেকে অনেকেই আসে চাকরি নিয়ে, হয়তো তাদেরই কেউ হবে বোধহয়।

ও নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে গৌরী তাড়া দেয়—চলো বাবা।

জানে, খেয়ালী লোকটি গানের আলোচনা সুরু হলে দিন কাবার করে দেবে না খেয়েই।

অপেরা পার্টির শ্রীনাথ রমেশ গিরিধারী এরা পোড় খাওয়া যাত্রা-ওয়ালা। দুদিন থিতু হবে এখানে। আর আজকের গান সুরু হবে রাত্রি এগারোটার পর। তাই হাতে সময়ও অনেক।

ওরা গুণী ব্যক্তি, কিছু তরতাজা পানীয়ের দরকার। আর যাযাবরের মত ঘুরে ঘুরে কোথায় কার কার কাছে কি দ্রব্য মিলবে এটার ঠিকানা ওরা সহজেই মালুম পেয়ে যায়। অচেনা জায়গাতেও নিমেষের মধ্যে ওরা রসিক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে নিয়ে মদের যোগাড়ও করে ফেলে। সুতরাং এখানে এসে ওই এক পথেই সন্ধান করে কাছারি বাড়ির পরিত্যক্ত নির্জনে রাম সিংকে খুঁজে পেতে দেরী হয় না। ওরাই গন্ধ শুঁকে গিয়ে হাজির হয়েছে।

রাম অবশ্য এক আধটু চোলাই-এর কারবার করে। কিন্তু নোতুন খদ্দের দেখলে সহজে ঘাড় কাৎ করে না। তাই ওই বাবুদের এখানে এসে হাজির হ'তে দেখে ঘাবড়ে যায়, আবগারীর লোকজন ছল করে এসেছে কিনা কে জানে।

লখিয়া ওদিকে একটা ছাগলকে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছিল, সেও আড়চোখে দেখছে বাবুদের। ইচ্ছে করেই তার পুরুষ্ট দেহের আবরণ-টাকে যেন খানিকটা শ্লথ করে রেখে তেরছা চোখে দেখছে ওদের।

শ্রীনাথ বলে—কি গো সিংজী, তুমি তো এখানের পুরোনো লোক। কিছু মাল ঝাল মানে ইয়ে—কোথায় মিলবে বলো দিকি?

দুহাতের তালু দিয়ে ইশারা করে দেখায় বস্তুটির পরিমাপ।

রামু সিং পয়লা চোটেই ঘাবড়ে গিয়ে বলে ওঠে—রামজীর কসম। ওসবের খবর হম্ কুছ না জানে বাবুজী।

রমেশ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ওকে দিয়ে বলে।

—যাত্রার দলের লোক আমরা, কোন ভয় নেই, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো দিকি। এখানে এসে তেষ্টায় গলা কাঠ হয়ে থাকবে—এ ক্যামন কথা!

লখিয়া এবার এগিয়ে এসে বেশ চড়াস্বরে বলে।

—দারু কাঁহা মিলবে হম্‌লোগ জানে না। দুকানমে যাও বাবু।

হাসে শ্রীনাথ।

—এত চটছো কেন? দোকান থেকেই না হয় এনে দাও সিংজী, এই নাও—আরও পাঁচ টাকা। ইমারা নোতুন লোক—আর ভাবীজী কিছু ছোলা ভিজে প্যাঁজ মানে ওই চাতালেই বসছি। ওখানে পাঁচ জনের সামনে এসব চলবে না, তাই এলাম নিরিবিলিতে।

লখিয়ার টাকা দেখে একটু মন ভিজেছে। তাই গজগজ করে বলে।

—বত্তা ঝুট ঝামেলা! লাও বাবু চানা মশল্লাকা পয়সা। হম্ বানা দেগা।

আরও কিছু খসলো তাদের। কিন্তু বেশ যুৎ করেই বসেছে তারা ওই দরবারে। আর রামু কোন দোকানের নাম করে এবার তার কুটির শিল্পের মালই হাজির করেছে। অবশ্য নিজেও দু'চার ঢোক ফাউ হিসেবে খেয়ে বেশ মস্ত হয়ে গেছে।

লখিয়াও আড়ালে থেকে দেখে ওদের। একটু নেশা চড়লে এক বোতল মদকে জল মিশিয়ে দু'বোতলে পুরে নাফা করার তাল খুঁজছে।

ললিত বৈকালে ঘুম থেকে উঠে ওদের দেখতে না পেয়ে বাইরে এল। তখনও মনে পড়ে তার সেই ভদ্রলোকের আর সেই মেয়েটির কথা। ওদের সুর তার মনে সাড়া এনেছে। এনেছে একটা পথের সন্ধান। এই যাত্রার জগতের মোহ তার নেই, এমনি শান্ত পরিবেশে সে সাধনা করতে চায়। আজ যেন তেমনি একটি আশ্বাস সে পেয়েছে।

—এ্যাই যে। দলের বাকীগুলি কোথায় বাপধন?

ললিতের ভাবনার জগতে বাধা পড়ে।

বিপিন ঘোষাল হিসেবী লোক। জানে তার লোকজনদের, তাই নজরে রাখতে হয়। না হলে কোথায় কে ঝামেলা বাধাবে কে জানে! তাই দলের সকলকে খুঁজতে বের হয়ে এখানে এসে শ্রীনাথ—রমেশদের না দেখে ললিতকেই কথাটা শুধোয় বিপিন।

ললিতও ওদের দেখে নি। সেই কথাটা জানাতে বিপিন ঘোষাল বলে ওঠে।

—জানো না কোথায় চরতে গেছে? ভাবছো নিজে বেশ গা বাঁচিয়ে থেকে অপরের বদনাম দিয়ে দলকে বিপদে ফেলবে?

অবাক হয় ললিত—কি বলছেন এসব কথা! ওদের তো ঘুম থেকে উঠে আর দেখি নি।

বিপিন ঘোষাল বলে—দ্যাখো বাপু, তুমি জানো কোথায় আছে তারা। দলের বেইজ্জৎ করো না এভাবে ফিচলেমি করে।

ললিত বিরক্ত হয়ে বলে।

—যদি ঘা দিই সামনাসামনিই দেব ঘোষাল মশাই, পিছনে ঘা দোব না। আপনার লোকজন কোথায় গেছে নিজেই দেখুন গে।

বিপিন ঘোষাল চেনে এদের। ফাঁক পেলেই শ্রীনাথ রমেশ কোথায় বেশী মাত্রায় মদ গিলে ফেলে বিপদ বাধাবে। রাত্রি বেলায় গান। আর ললিতকেও সে যেন ভরসা করতে পারছে না। তবু রাগটা চেপে বলে।

—তুমি ছাখো বাপু একটু কোথায় গেল তারা। আমিও দেখছি ব্যাটাদের।

ললিত বের হয়েছে ওদের সন্ধানে। বেলা পড়ে আসছে। নির্জন ধ্বংসপুরীর এদিক ওদিক খুঁজছে সে। দলে এসে দেখেছে মাঝে মাঝে এমনি সব নানা বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। মদের নেশায় সিন ফেল করে কাণ্ড বাধায়। না হয় নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বাধে। আর প্রেম নিয়ে ঝামেলা তো আছেই। ললিতের এসব বালাই নেই। নিজে মদ-ফদ ছোঁয় না—তাই কাউকে মদের দোকানের কথা শুধোতেও বিশ্রী লাগে। কোথায় খুঁজবে? হতাশ হয়ে ফিরে আসছে, হঠাৎ ঢোলক খঞ্জনী আর কাদের গলার সমবেত বেসুরো গান শুনে দাঁড়ালো।

ওই দিকটায় এগিয়ে গিয়ে পাঁচিলের ওপাশে রমেশ—শ্রীনাথদের দেখে অবাক হয়। রামু সিং-এর চ্যালাও এসে গেছে, মত্তপ অবস্থায় তারা সমবেত কণ্ঠে এখন ভজন গাইছে।

—এ্যাই !

ললিতকে দেখে ওরা চাইল। শ্রীনাথ বলে—এসো কিন্নর কণ্ঠ, হয়ে যাক এক গ্লাশ। এ্যাই লখিয়া—দে বাবুকে এক গ্লাশ জমিয়ে দে।

এর মধ্যে লখিয়াকেও তারা চিনে ফেলেছে। রামুর দ্রব্যগুণে ওই ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেয় সহজেই। ললিত ওদের দেখে বলে।

—ঘোষালমশাই তোমাদের জন্যে যা তা বলে গেল আমাকে। চলো তোমরা।

শ্রীনাথ ঘোষালের নাম শুনে গর্জে ওঠে—ইয়ে করি তোমার ঘোষালের। এটা কি যাত্রার আসর!

রমেশও বলে—আমাদের যা খুশী করবো, সে তোমাকে কথা শোনাবে কেন হ্যা! তুমি কি আমাদের গার্জেন?

গিরিধারী হাতের গেলাসটা নিয়ে ললিতের কাছে এসে বলে।

—দু'ঢোঁক পেঁদিয়ে দে বদাস্ বদাস্ করে ললিত, দেখবি মেজাজ সাফ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এমন সময় ওদের সামনে স্বয়ং বিপিন ঘোষাল এসে হাজির হয়েছে। ওই জমাট আসর আর বোতলের গড়াগড়ি দেখে বিপিন ঘোষাল ব্যাপারটা বুঝে বলে ওঠে।

—এই হচ্ছে? আজ রাতে গান, আর তোরা এই করছিস। কে এনেছিল তোদের এখানে?

ললিতের দিকে চাইল সে। ললিতও অবাক হয়। ওই শ্রীনাথ —রমেশের দলও এক নিমেষে বদলে গেছে। তাদের সব তেজ হুঙ্কার মুছে যায়। মিন মিন করে গিরিধারি বলে—মাইরী ঘোষাল মশাই, আমরা আসতে চাই নি। মা কালির দিব্যি!

বিপিন গর্জে ওঠে—ফের মিছে কথা বলছিস? এ্যাই রমেশ, এর আগে দুবার মাল খেয়ে সিন ফেল করেছিস। দলের বদনাম আর

করতে দেব না। তোকে পাকাপাকি নোটিস দিচ্ছি। এবার দূর হয়ে যা!

বিপিন ঘোষাল চটে গেছে। রমেশ বলে ওঠে—

তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালছি ঘোষাল মশাই, আসতে আমি চাই নি। তা ওই ললিতই টাকা দিয়ে বললে—একটু ঘুরে ফিরে আয়, সরেস জিনিসও আছে এখানে।

—এ্যাঁ!

বিপিন ঘোষাল ললিতের দিকে চাইল। ললিতও অবাক হয়েছে ওই মাতাল লোকগুলোর কথা শুনে। শ্রীনাথ তখন কাঁদকাঁদ সুরে বলে চলেছে ঘোষালকে।

—মাইরী ঘোষাল মশাই, খেতে আমরা চাই নি, তা ওই ললিতই এসব টাকা পয়সা দিয়ে নিয়ে এল।

ব্যাপারটা ঘুরে গেছে। এখন বিপিন ঘোষাল বুঝেছে যে ললিতই এদের এনে মদ গিলিয়েছে। আর তার উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে বিপিনের সামনে।

কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল প্রথম থেকে লখিয়া। ওই নোতুন বাবুটিকে সে দেখেছে আর দেখেছে এদের মিথ্যা কথা বলার স্বভাবটা। ওরা যেন দল বেঁধে মিছে কথা বলে ওই ছোকরা বাবুকে বিপদে ফেলতে চায়। তেজী বেপরোয়া মেয়েটি এবার মারমুখী হয়ে উঠে। শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে নধর গা গতরের সাড়া তুলে লখিয়া নিটোল হাতে রূপোর ইয়া বালা নেড়ে একেবারে মাতাল বাহিনীর সামনে এসে গর্জন করে ওঠে শ্রীনাথের মুখের সামনে।

এ্যাই উল্লুককা বাচ্চে, ঝুট কাহে বোলতা বে? তিন আদমী তুলোক আকে পয়সা দিয়ে দারু আনালি—হম ঝালচানা বানালো, ফিন্ বোলতা উ-বাবু, তুলোক্কো লিয়ে এ'ল? শ্লা ঝুট বোলতা। উ-বাবু তো আভি এল।

শ্রীনাথ একটু ঘাবড়ে গেছল। রমেশ তবু সামলে নিয়ে গা বাঁচাবার জন্য বলে—না তো কি? মদের আড্ডা আমরা চিনতাম?

গর্জে ওঠে লখিয়া—শ্লা মাতালকে মদের দুকান পহচান করাতে হয় কভি? ঝুট বোলতা কাহে, আবে এই কুত্তা? সাচ বোল্—

গর্জে ওঠে শ্রীনাথ—চুপ কর, এ্যাই মিছে কথা বলবি না। খবরদার!

ঘোষালও অবাক হয়। তার চেয়েও অবাক হয়েছে ললিত। এই লোকগুলো যে সব দোষ তার ঘাড়েই চাপাবে ভাবতে পারেনি। কিন্তু রুখে উঠেছে ওই মেয়েটি। শ্রীনাথকে গর্জে উঠতে দেখে লখিয়াও চটে ওঠে। তাকে ধমকাবে এমন মরদ নেই। সে শোনায়—

চুপ রে। ডাঁটবে ফিন্ হামাকে? আবে ঝুট খানেবালা নৌটঙ্কিকা বাচ্চা—হম্ ঝুট বোলতা!

লখিয়া এরপর যা করলো, সেটা ভাবতেই পারে না লখিয়া। সামনে পড়েছিল একটা পোক্ত ঝাঁটা—সেই মেয়েটা ঝাঁটাগাছটা তুলে নিয়ে সপাটে এক ঘা ঝেড়েছে শ্রীনাথের মুখে, তারপরই উদ্যত হাতিয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রমেশের ওপর।

প্রতিপক্ষ ঘায়েল আর লখিয়ার ওই নিদারুণ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সিঁটকে বিপিন ঘোষাল দৌড়চ্ছে আর পিছু পিছু দৌড়চ্ছে ওই শ্রীনাথ—রমেশ আর গিরিধারী। লখিয়া তখন রণ-রঙ্গিনী মূর্তিতে গর্জাচ্ছে।

—আও ঝুটকা বাচ্চে। মু তোড় দেব তুহার।

লখিয়া এবার ওদের পালাতে দেখে হাতের ঝাঁটা ফেলে গর্জায়।

এদিকে চাইতে দেখে, সেই নোতুন বাবুটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ললিত অবাক হয়ে দেখছে ওই তেজী মেয়েটিকে। তাকে চেনে না মেয়েটি—কিন্তু তার বিরুদ্ধে এই হীন ষড়যন্ত্রটা দেখে সে বিদ্রোহে

ফেটে পড়ে ওই লোকগুলোকে সায়েস্তা করে দিয়েছে। ললিত ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

লখিয়া ওকে দেখে বলে।

—তুমি ওখানে কাম করো বাবুজী? ওই বেইমান লোকগুলোর সাথে?

ললিত মাথা নাড়ে। বেশ স্পষ্টভাবে বলে লখিয়া!

—উ কাম করো না। উলোক তুহাকে ফাঁসিয়ে দেবে জরুর।

ললিত জবাব দিল না। লখিয়া দেখছে ওকে। মেয়েটা এবার রামুকে নিয়ে পড়ে—উঠ্ বে!

রামু অবশ্য মজাটা দেখছিল, সেও ওই বাবুটির জন্য দুঃখ বোধ করে।

কিন্তু তার করার কিছুই নেই—তবু অপরাধীর মত বলে সে:

—উ লোক এসে দারু মাংলো, সে ভুল কিয়া লখিয়া।

ললিত জবাব দিল না।

ললিত ফিরছে বাসার দিকে। প্রাসাদপুরীর এলাকায় সন্ধ্যা নামছে। এখানে লোকজনের যাতায়াত কম। দীঘির জলে দু-একটা পানকৌড়ি তখনও ডুব সাঁতার দিয়ে চলেছে। তার মনে হয় এবার বিপিন অপেরা তাকে সত্যিই ছাড়তে হবে। তার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েছে সে। কারণ তারা সকলেই এবার বিশ্বাস করেছে যে ওই মেয়েটি যা করেছে তা তার প্ররোচনাতেই করেছে। ঝাঁটার প্রহার ভুলবে না বিপিন। আর দল থেকে বের হতে হবে ললিতকে। ওখানে আর থাকা চলবে না। চায় না সেও। তবে ছাড়তে হলে সে জবাবটা দিয়েই ছাড়বে। ওই লোকগুলো—ওই দলের ওপর আর তার কোন মোহ নেই।

খবরটা এর মধ্যে নানা রং চড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দলের মধ্যে।

ধীরা আর বিজিতবাবুর কানেও উঠেছে। দলের প্রধান অভিনেতা বলে।

—দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো! এসব নোংরামি করবে দলে? নেভার।

এমন সময় ওই ভাঙাবাড়ির ধ্বংসস্তুপ টপকে বিপিন ঘোষাল আর পিছনে তিন মূর্তিকে আসতে দেখে চাইল ওরা। হাঁপাচ্ছে ঘোষাল—ওই লখিয়ার ঝাঁটার ভয়ে দৌড়তে গিয়ে কাছা কোঁচা খুলে গেছে।

গর্জাচ্ছে বিপিন ঘোষাল।

—আজ রাফসাফ করে দোব। দলে এসব দেখলে তখুনি আউট করে দোব। কি মেয়েরে বাবা! ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দিতো রে!

শ্রীনাথের বদন বিগড়ে গেছে। সপাট ঝাঁটার চোটে। কেটে-কুটে গিয়ে রমেশের নেশা ছুটে গেছে। ছিটকে পড়েছিল সে। অক্ষত রয়েছে কেবল গিরিধারী। ব্যাপারটা এখন বিপিন ঘোষাল কিছুটা বুঝে চুপ করে থাকে আপাতত।

ললিত বাসায় ফিরে দেখে সব চুপচাপ। ঘোষাল মশাই বলে ওঠে গম্ভীরভাবে।

—যাও। আসরে যাবার টাইম হয়ে এসেছে। দয়া করে পার্টটা ঠিক ঠিক করে উদ্ধার করো। উঃ—দল করে ঝকমারি করেছি। এবার এসব পাট তুলে দিয়ে নোতুন বাজারে আলুর আড়তই করবো। এসব ভদ্দর লোকে করে? ছ্যা-ছ্যা।

পঁচিশ বছর ধরেই অবশ্য বিপিন ঘোষাল এই কথা বলে আসছে, আজও সেটা কাজে পরিণত করে নি।

ললিত কি যেন বলতে চায়। মনে হয় জবাবই দেবে সে।

ধীরা বিজিতবাবুও রয়েছে। ধীরার দুচোখে ঘৃণা আর অবজ্ঞা। ধীরা বলে ওঠে—

ভদ্দর লোক নিয়ে দল করবেন ঘোষাল মশাই। গুণী শিল্পীদের নেবেন। কাজ পাবেন, এসব অকাজে তারা থাকে না।

ললিত চুপ করে বের হয়ে এল। জবাবটা সে ধীরাকেই দেবে এবার। মনে মনে তার জন্যই তৈরী হয়। ওই ধীরা বিজিতবাবুর দলই এরাজ্যে নানা কৌশল করে টিকে আছে। ভালো লোককে তারা থাকতে দেবে না। তাই সরে যাবে ললিত।

ললিত সেটা আরও নিশ্চিন্ত হয়েছে। কারণ ভেবেছিল শ্রীনাথরা তার নামে মিথ্যা বলেছে, বিপিন ঘোষালও তাকে ওদের কথায় যা তা বলেছিল অন্যায় অবিচার করেছিল তার উপর। এতবড় অবিচারের জন্য ভেবেছিল বিপিন ঘোষাল অন্ততঃ দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু বিপিন ঘোষাল সে দিকেই গেল না। উল্টে বলে বিপিন।

—তাই বলছিলাম এই রাঙা মূলো ললিতকে বড় শিল্পীদের কাছে শেখার অনেক আছে, শেখ, তা এসব বাজে কাজ করবে, না শিখবে ?

ললিত বলে ওঠে—ওসব কাজের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। নিজে দেখে এলেন তো ?

বিপিন ঘোষাল গর্জে ওঠে—

থাক্। আর সাধু সেজে কাজ নেই। ওই মাগীর এ্যাতো তোমার ওপর দরদ ক্যানো হ্যা ? যাও, নিজের কাজে যাও। আর শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না।

এতবড় অপবাদে ললিত রাগে অপমানে এবার জ্বলে ওঠে। বিপিন ঘোষাল যে এত নীচ আর ওই ধীরা বিজিত বাবুরাও যে এইসব নোংরামিকে সমর্থন করবে শিল্পী হয়ে তা ভাবতেই পারেনি।

ললিত বলে।

—কি যা তা বলছেন ঘোষাল মশাই ? আমি ওদের কাউকেই চিনি না। আপনি ওই রমেশদের দেখতে বললেন, তাই বের হয়ে

খুঁজতে খুঁজতে ওদিকে গেছলাম। চিনিনা কাউকে, আর শুধু শুধু এমনি জঘন্য একটা অপবাদ দিচ্ছেন একজন ভদ্রলোককে!

—ভদ্রলোক!

ধীরা এবার তীক্ষ্ণস্বরে মন্তব্য করে।

হাসছে বিজিত। ধীরা যেন সেদিনকার অপমানটার শোধ নিতে চায়। আর জানে ধীরা, বিজিতবাবু তাকে সমর্থন করবেই। আর তাদের সব কিছুকেই মাথা পেতে মেনে নেবে বিপিন ঘোষাল, কারণ তারা দুজনেই দলের একনম্বর। তাদের নেবার জন্য অন্য সব দল ওৎ পেতে বসে আছে।

ললিত চাইল ধীরার দিকে। ওই কথাটাতে জ্বলে উঠেছে ললিত, জানে সে ধীরার পরিচয়, সেটা অন্ধকারে ঢাকা। তার তুলনায় ললিত অনেক বড় ঘরের ছেলে, ইচ্ছে করেই সেই পরিচয়টা এখানে সে দেয়নি। কেউ জানে না।

তবু কথাটা ললিতের বংশ মর্য্যাদায়—তার ব্যক্তিত্বে বাধে। বলে ওঠে ললিত—ভদ্রলোকের ডেফিনেশনটা আগে জেনে তবে ওই কথাটা কাউকে বলবেন! আর ঘোষাল মশাই, দলে কাজ করে বলে অন্য কারোও সম্মান নেই সেটা ভাববেন না। ওঁদেরও কথাটা স্মরণ রাখতে বলবেন। আর আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না।

চলে গেল ললিত, কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বলে। গর্জে ওঠে ধীরা—আমাকে অপমান করে গেল? এর বিহিত করতেই হবে।

বিজিতও গম্ভীর মুখে বলে—শুনলেন তো ঘোষাল মশাই; এসব সহ্য করবো না! ভদ্রলোক! কে, ওটা?

বিপিন ঘোষালও রাগটা এবার সোচ্চার করে বলে—দেখে নেব এবার। এমন শিক্ষা দেব বাছাধনকে, সেদিন টের পাবে।

বিপিন ঘোষালকে চেনেনি। এমন আর্টিষ্ট ঢের দেখা আছে আমার। এবার দেখছি।

বিজিতবাবু বলে—এবার তাই দেখুন। নাহলে এসব ইনসাল্ট সয়ে আমরাও থাকবো না।

বিপিন ঘোষাল ওর হাত দুটো ধরে বলে—ক্ষমা করুন স্যার, আমি এর ব্যবস্থা করবোই! দেখবেন এবার।

দেবগ্রামের আসরের সুনাম আছে। জেলার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সামিয়ানা টাঙানো, ডেলাইটের আলোয় ঝকমক করে আসর। মাঝখানে লালশালু মোড়া আসর—দুদিকে বসেছে সুরপার্টি। তাদের ঢোলক-এ মেঘগর্জনে গুরুগুরু শব্দ ওঠে। সারা আসর গমগম করছে।

বিপিন অপেরার নামডাক আছে। তাই এখানের চারিদিকে বিশেষ ব্যক্তিরা এসেছেন, আর এর মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে আজকের পালা হবে গানবহুল, কাঞ্চীপুর রাজ্যের কোন সঙ্গীতশিল্পীর কাহিনী। তাদের দলে নামকরা গাইয়েও এসেছে একজন!

আসরে দেবকণ্ঠবাবু আসতে চায় নি।

মহানন্দ চৌধুরীর ওখানে বৈকালে যেতে মহানন্দবাবু বলে—

চলো। ভালো না লাগে চলে আসা যাবে। শুনছি নাকি এ পালাটা ওরা ভালো গায়।

ললিতের সাজগোজ হয়ে গেছে। আজ সে গম্ভীর হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে রমেশ শ্রীনাথরাও চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে কথা বলার, কিন্তু ললিতই এড়িয়ে গেছে।

বিপিন ঘোষাল আসরে দুটো ঘণ্টা বাজাবার নির্দেশ দিয়ে এসেছে সাজঘরে। সে বলে—

দারুণ আসর, জমিয়ে গান করতে হবে বাবা সকল। দেখি বিজিতবাবু—ধারাদের কতদূর হ'ল।

অবশ্য যাত্রার দলের নিয়মানুবর্তিতা আসরে যথেষ্ট কড়া। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সেটা মেনে চলে। সময়ের বিচ্যুতি তাদের বড় একটা হয় না।

তাছাড়া দেবগ্রামের নামী আসরে লোকও এসেছে অনেক। সময় মতই গান শুরু হয়। কনসার্ট, তারপর একক দেবদাসী নৃত্যও দিয়েছে একটা। সঙ্গীতবহুল পালা, তাই নাচটাও একটু ক্লাসিক ঘেঁষা। তারপর পালা সুরু হয়। গান জমে উঠেছে। ললিত আসরে গিয়ে ওই ভিড়ের দিকে চেয়ে অবাক হয়। সামনেই বসে আছেন আজ সকালের দেখা সেই ভদ্রলোক। ওদিকে তার মেয়েও রয়েছে, মহানন্দবাবুকে চেনে না—কিন্তু তার চেহারা আর পোশাক-আশাকে মনে হয় সমঝদার তিনিও।

পাশেই সেই আদক কোম্পানীর ওখানে দেখা কালো মুষকো লোকটাকেও দেখা যায়, কালো আলকাতরার মত রং-এর ওপর আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবীর হীরার বোতামগুলো ঝকঝক করে। গোদা গোদা আঙুলের কয়েকটা আংটি আর মোষের কাঁধের মত ফাটা ফাটা গলার চামড়ার ওপর সোনার হারটা দেখা যায়।

...ললিত আশাবরীর সুরে গানটা ধরেছে। আজ ইচ্ছে করেই ললিত গানের আলাপটা একটু ঠায়এ ধরেছে। আর দ্রুতলয়ে গিয়ে বৈঠকী ভঙ্গীতে দুচারটে তান কর্তনও করে। নিপুণভাবে লয়কারী ফুটে ওঠে নিখুঁত রূপে।

—সাবাস!...

আসরের থেকে বাহবা ধ্বনি ওঠে। ললিত চেয়ে দেখে সেই ভদ্রলোককে—সেও মুগ্ধ হয়ে শুনছে ওই রাগপ্রধান গানের উপস্থাপনা।

আরও অবাক হয়েছে দেবকণ্ঠ যে, এত লোকও ওই বৈঠকী ভঙ্গীতে গাওয়া মার্গসঙ্গীতটা উপভোগ করে। তার কাছে এ যেন

একটা নোতুন অভিজ্ঞতা। পরিবেশন ঠিকমত করতে পারলে এ জিনিসও এখানের মানুষ নিতে পারে।

হাততালি বাড়ছে, গান-এর মধ্যেই প্রস্থান করে দরিদ্র গায়করূপে ললিত। দেবকণ্ঠও অবাক হয়।

...সকালের দেখা সেই ছেলেটি যে যাত্রার দলের লোক তা জানতো না সে। আর তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে দেবকণ্ঠ ; গৌরীও দেখছে তাকে।

দেবকণ্ঠ বলে—

সত্যিকার শিল্পী ও। নাহলে এত বড় গানটাকে কি ভাবে গাইল, তাজ্জব !

গৌরী বলে—সত্যি অপূর্ব বাবা !

মহানন্দ চৌধুরী শোনায়—কি হে কণ্ঠ, ক্যামন শুনলে বলো ! সত্যি গানের চর্চা করেছে ছেলেটি। আর সুর লয় তাল জ্ঞানও সুন্দর। দেবকণ্ঠ বিস্মিত হয়েছেন, দেখেছেন ওর গানে নোতুন এক দিগন্তকে। মার্গসঙ্গীতকে একটু রূপবদল করে পরিবেশন করতে পারলে লোকে আজও নেয়। তার প্রমাণ পেয়েছেন। খুশি হয় দেবকণ্ঠ।

রামু লখিয়ারাও দল বেঁধে এসেছিল। লখিয়া বৈকালের সেই ঘটনার পর ওই বাবুকে আসরে এভাবে গাইতে দেখে রামুর ভুঁড়িতে কনুই-এর গুঁতো মেরে বলে—

ক্যায়সা গানা—শুনা ? তুহার মতো চিল্লায় না বাবুজী। শুন বে।

রামুরও নেশার ঘোর তখনও গোলাবী হয়ে আছে। রামু মাথা নেড়ে বলে—

হ্যাঁ। বড়িয়া গানা—বড়া কলাবৎ। আহা !

...যাত্রার আসর জমে উঠছে। কিন্তু প্রমাদ গণেছে বিজিতবাবু। আজকের সব হাততালি কুড়িয়ে আনছে ওই ললিত। আর ধীরা ওর প্রতিপক্ষ শিল্পী। গানে ধীরারও নাম আছে যাত্রা জগতে। কিন্তু

ললিতের গান আজ অন্য জাতের রং এনেছে। তার সুরেলা গলায় ফুলঝুরি ফুটছে। সারা আসর তার গানে মুগ্ধ।

ধীরা মনে মনে চটে উঠেছে। তার গান ওই গানের পরিপ্রেক্ষিতে জমছে না। অনেক চটুল—অনেক নীরেস। কোন রকমে ধিন শেষ করে বের হয়ে এসেছে। সে হাততালিও নেই। ধীরা গজগজ করে—

আসরে ওকি একাই শিল্পী। আমাকে অভিনয় গান শিখতে হবে ওই কালকের ছোঁড়ার কাছে? এদলে আর থাকছি না।

বিজিতবাবু ওকে থামাবার চেষ্টা করে। বিজিতবাবু বলে—

মেজাজ খারাপ করো না। ধীরা। আজকের নাটক শেষ হতে দাও। তারপর বিপিন ঘোষালের সঙ্গে কথাটা হবে—

ধীরা ফুঁসছে রাগে-অপমানে। বিজিত বলে—

হয় ওই ললিত না হয় আমরা থাকবো এ দলে। এ-অপমান আমিও সইবো না।

...বিপিন ঘোষালও বুঝেছে পালা জমলেও একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ঝড়ও উঠবে দলের মধ্যে। ললিত আজ যেন প্রতিজ্ঞা করে নেমেছে—গানগুলো ওর আসরে কি সাড়া এনেছে, তার কাছে ধীরার গান বিজিতবাবুব দাপটের অভিনয় সব কেমন জোলো হয়ে গেছে। সুরে সুরে ভরে গেছে আসরের পরিবেশ।

দেবগ্রামের মানুষও যেন নোতুন এক স্বাদ পেয়েছে—এ মাটির হারানো ঐতিহ্যের স্পর্শ ফিরে পেয়েছে ওই গানে গানে। সারা আসর স্তব্ধ হয়ে শুনছে সেই গান। আর ললিতও প্রাণ ভরে গাইছে আজ। শ্রোতারা আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে, সেই গানের প্রতিযোগিতাব দৃশ্য।

...এবার রাজকুমারীর সঙ্গে রাজসভায় সেই গায়কের প্রতি-যোগিতার সিন। ধীরাকে সেজেগুজে রাজকন্যার মতই দেখাচ্ছে।

গান সুরু হয়েছে। বিচারক স্বয়ং কাঞ্চীপুরের রাজা—বিজিত রাজার ভুমিকায় নেমেছে।

...গানের সুরটা ছড়িয়ে পড়ে—রাজকন্যার কাছেই একমাত্র পরাজিত হবে সেই গায়ক। রাজকন্যা তাকেই স্বীকৃতি দেবে—স্বামীর স্বীকৃতি।

...তানকর্তনগুলো ধীরা এড়িয়ে চলে। তাই এইখানে তাদের গানে ধীরার প্রাধান্যই বেশী থাকে। বসন্ত রাগের ওপর জমাট ধরনের গান। ধীরা গাইছে। মাঝে মাঝে গলা দিতে হয় ললিতকেও।

আজ ললিত ইচ্ছে করে বসন্ত-এর সুরে এনেছে বাহারের কিছু পর্দা। বসন্ত বাহার-এর সুরেলা আলাপ-এর পর দ্রুতলয়ে এসেছে।

ধীরাও ভাবতে পারেনি যে ললিত হঠাৎ এইভাবে গানে অন্য পর্দা লাগাবে—তার রেওয়াজ এত নেই, তবু মনের দুর্বার রাগটা চেপে সেও গাইবার চেষ্টা করে।

গলাটা চড়িয়ে তান করে চমকে দেয় ধীরা—সকলকে ও জানাতে চায় সেও কম নয়।

ললিত এবার তান-এর মুখে তার রেওয়াজী গলা থেকে সুরটা একেবারে পঞ্চমে তুলে লয়কারী করতেই—চমকে ওঠে ধীরা। সেই গান-এর তান ফিরিয়ে আনার সাধ্য তার নেই। ধীরা ঘামছে পরাজয়ের গ্লানিতে।

সারা আসরে তখন ললিতের সুর—বসন্ত বাহারের আলাপ যেন বসন্তকে জাগিয়ে তুলেছে। হাততালি পড়ছে—কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ধীরা।

বিজিতও রাগের চোটে সিংহাসন থেকে উঠে এবার ওই দুর্বিনীত গায়ককে কচু কাটা করবে, কিন্তু ললিতই ব্যাপারটা পুরো ইচ্ছে করেই করেছিল, তাই সে সোমের আগেই তানটাকে নামিয়ে এনেছে।

ধীরা কোনরকম এবার গলা মিশিয়ে এ যাত্রা উদ্ধার পেল।

সারা আসর ফেটে পড়ে কি উল্লাসে হাত তালিতে।

সাজঘরে ধীরা ফেটে পড়ে।

এসবের মানে কি ঘোষাল মশাই? বই যা আছে তেমনি নাটক চলবে, না কারো খেয়াল খুশীমত চলবে এই বই?

বিজিতও শোনায়।

তাহলে ওই ললিতবাবুকেই টপ করে দল চালাবেন। আমরা কেন পড়ে থাকবো?

আজকের মত গান শেষ হয়েছে। এখানে অদ্য শেষ রজনী। কিন্তু যাবার আগে দেবগ্রাম থেকে বিজিত ধীরা যেন কালো মুখ নিয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা খুশীতে কলরব করতে করতে চলেছে।

যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। দর্শকরা দারুণ খুশী।

কিন্তু বিপিন ঘোষালের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। ভরা মরশুমে বিজিত ধীরা বেঁকে বসলে তাঁর সমূহ বিপদ। তাই বিপিন ঘোষাল হাঁক দেয়।

ললিতবাবুকে ডাক।

ললিতও জানতো এরকম একটা কিছু ঘটবে। তাই কাছেই ছিল সে। আজ সে তার জবাব দিয়েছে ধীরাকে। এবার জবাবটা বিপিন ঘোষালকেই দেবে।

তাই এগিয়ে আসে ললিত। বিপিন ঘোষাল কিছু বলার আগেই ললিত বলে —

এ যাত্রার দলে অদ্য আমার শেষ রজনী বিপিনবাবু, কাল থেকে আমি থাকছি না। বড়দের কাছে শেখার কথা বলেছিলেন। দেখলাম শেখার তেমন কিছু এখানে নেই। তাই চলে যাচ্ছি।

কথাটা ওদের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বের হয়ে গেল ললিত।

তখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপিন ঘোষাল। ও চলে যেতে এবার সম্বিৎ ফেরে তাঁর। বিপিন ঘোষাল গর্জে ওঠে।

—অসভ্য ইতর কোথাকার। নিজে না গেলে এই বিপিন ঘোষালই ঘাড় ধরে আউট করে দিত তাকে। সহবৎ শেখে নি এখনও।

ধীরা বিজিতবাবুর দাবী অবশ্য রয়ে গেছে—তবু মনে হয় ওই উদ্ধত তরুণ যেন তাদের মুখের ওপর অপমান করে গেল। আর তারা সেটা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে।

ললিত যেন সুরের গহনে হারিয়ে গেছে। টোড়ি বিলাপখানি টোড়ির সরগম উঠছে, বাতাসে জাগে বকুল গন্ধ—পাখীর কলরব ওঠে সবুজ গাছ গাছালির আড়ালে। সুরটা সারা আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে।

—বাবুজী। এ—বাবুজী!

হঠাৎ কার কঠিন গলার খনখনে আওয়াজে সুরটা হারিয়ে যায়। উঠে বসল ললিত কঠিন মেজেতে। শূন্য ঘর।

প্রথমে ঠাওর করতে পারে না কোথায় যেন রয়েছে সে। বিরাট হল ঘরটা জনশূন্য, বড় সতরঞ্চিটা ফাঁকা—যাত্রাদলের সকলে এখানে ছিল। ওদের যাত্রা শেষ হবার পর আবার গাড়িতে মালপত্র তুলে ভোর রাতেই পাড়ি জমায় অন্য কোন আসরের দিকে। আর সে পড়ে আছে এখানে একা। হঠাৎ এই নিঃসঙ্গতাটা তার মনে কি বেদনা আনে। দল থেকে সে আজ সরে গেছে। তাকে তাই কেউ ডাকেনি। তাকে ফেলে রেখেই ওরা সবাই চলে গেছে। বাতিল-সে আজ ওদের কাছে।

দলের কাজ থেকে কাল রাতেই জবাব দিয়েছিল, সুতরাং দলের আর কেউ সে নয়। তাই একাই এই শূন্য হল ঘরে বেঘোরে ঘুমিয়েছিল সারারাত। কেউ ডাকেনি। নেই ও।

আজ সে একা, নিঃসঙ্গ।

হাসছে ললিত। লখিয়া ঘরটা পরিষ্কার করে সতরঞ্জি নিতে এসেছিল এই হলঘর থেকে, আর একা ওই বাবুকেগ ড়াগড়ি খেতে দেখে অবাক হয়ে ডাকছিল সে।

ললিত লখিয়াকে দেখে চিনতে পারে। এখানে ঝাঁটা হাতে মেয়েটাকে দেখে ঘাবড়ে যায় ললিত, সেই বৈকালে ঝাঁটা নিয়ে ওর কাণ্ডটা মনে পড়ে। আবার এখানেই কিছু বাধাবে কিনা কে জানে। তাই ললিত উঠে বসে ওর দিকে চাইল। একটু অবাক হয়েছে সে ওকে দেখে।

লখিয়া এসেছিল ঘরটা সাফ করতে। যাত্রা দলের ওরা সবাই চলে গেছে, কিন্তু এখানে ওকে একা দেখে শুধোয়।

—বাবুজী আপনি গেলেন না? সব কোই তো রাতসে ভেগে গেল বাস লিয়ে।

ললিত ব্যাপারটা ক্রমশ স্মরণ করতে পারে। ললিত ওদের দলের কেউ নয়।

সে তাই বলে—কাল থেকে ওই দলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি আমি। তাই নিয়ে যায়নি আমাকে।

লখিয়া অবাক হয়।

হঁা। এত আচ্ছা গানা করলেন, ফিন নোকরী না রহল? তাজ্জব! শ্লা লোগ্ বেইমান বাবুজী।

ললিত বলে—তাজ্জবই বটে।

—তা এখন কি করবেন? নোকরী না রহল—খানা দানা ভি তো চাহিয়ে, রহনে কী জায়গা ভি চাহিয়ে। কুছ তো ভি করনে হোগা।

ললিত মেয়েটার মুখে চোখে দেখেছে ভাবনার ছায়া। ওই বেপরোয়া মেয়েটার মনের অতলে কোথায় এতটুকু সমবেদনার আভাস জেগে ওঠে!

ললিত বলে—এখানেই ওস্তাদজীর কাছে গান শিখবো। ওই যে বকুলগাছ-ওয়ালা বড় বাড়ি।

লখিয়া অবাক হয়—হ্যাঁ হ্যাঁ, গৌরী দিদিমণিদের বাড়ি। উঁহার পিতাজী বহুৎ বড়া 'কলাবৎ হ্যায়'! তো বহুৎ মুস্কিলকা বাত—রহেগা কাঁহা, খায়েগা কাঁহা?

হঠাৎ রামুকে এদিকে আসতে দেখে হাঁক পাড়ে লখিয়া। রামু এসেছিল ভারী সতরঞ্জি দুটো এবার দলের লোকজন চলে যেতে আবার বাবুদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে। লখিয়ার সঙ্গে ললিতকে কথা বলতে দেখে রামু অবাক হয়—আরে ওস্তাদজী। ক্যা গানা গায়া—দিল তরর হো গিয়া। আহা বালম মেরে রসিয়া—রামু হেঁড়ে গলায় গান সুরু করে।

—এ্যাই বে!

লখিয়ার ধমকে রামুর গানটা থেমে যায়। লখিয়াই এবার ললিতের বিপদের কথাটা জানাতে রামু সিং কি ভেবে বলে ওঠে।

—কোই ফিকির মৎকরনা। সব বন্দোবস্ত পাক্কা হো যায়েগা। হম কর দেগী। ওস্তাদ হিঁয়াই থাকবে। জরুর থাকবে। মেরে ওস্তাদ!

রামু বেশ সরিফ মেজাজে বলে ওঠে।

ললিত অবাক হয়—থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে?

রামু সিং বলে—

দেবগ্রাম কলাবৎ কা ইজ্জৎ দিতে জানে বাবুজী। চলো হামারা সাথ। আরে এ লখিয়া তু উধারকা বগলবালা কামরাকো সাফ কর দো। বাবুজী আমাদের নজদিক থাকবে।

চলোজী—সে বন্দোবস্ত করে আসছি।

মহানন্দবাবু কাল গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। দেবগ্রামের মাটির হারানো সেই গানের সুর, আশাবরীর আলাপ বসন্ত বাহারের চকিত ছন্দের তানকর্তন আবার জেগে উঠেছিল। ওই সুরের সঙ্গে মিশিয়ে আছে যৌবনের কত স্মৃতির সুরভি কতো হাসি অশ্রু দিয়ে ভরা অনেক মুহূর্ত।

ছোকরা অপূর্ব গেয়েছে। গান-এর মেজাজও সুন্দর।

আজ সকালে মহানন্দবাবু তাই কি খেয়ালের ঘোরে বহুকাল পর আবার এস্রাজ নিয়ে বসেছে। অনেক দিনের অব্যবহারের ফলে খোলে ধুলো জমেছে, তারগুলো বাঁধতে থাকে! আবার শূন্য ঘরটায় বহুদিন পর সুর ওঠে, আশাবরীর কোমল করুণ সুর।

বাসনা বেশ ক'বছর পর বাবাকে আবার এস্রাজ নিয়ে বসতে দেখে চাইল, চা নিয়ে ঘরে এসেছিল বাসনা। মা মারা যাবার পর থেকেই বাবা কেমন বদলে গেছেন। তার বহুদিনের প্রিয় ওই যন্ত্র নিয়ে গানের মহফিল বসাতো এই হলঘরে তখন প্রায়ই।

মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হতো ওই সব নিয়ে।

এতকাল কেটেছে, তখন জমিদারী ছিল চলতো, এখন চলবে? ওদিকে মেয়ে বড় হচ্ছে, তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হবে না?

কথাটা মিথ্যা নয়। জমিদারী চলে যাবার পর আয়পয় কমে গেছে, অথচ সামনে এতবড় ঘটা, সব মিলিয়ে সেই ঠাট রাখা আর সম্ভব নয়। চাকর-বাকরদের অনেককে বিদায় করতে হয়েছে। দেবসেবাও অচল হয়ে আসছে। সেই সুর—দিনগুলো হারিয়ে যাচ্ছে কি বেদনার অতলে! তবু মহানন্দ চৌধুরী হাসতো। অভাবের ছায়া নেমেছে বড় বাড়িতে। নিজেদের ঠাটবাট বজায় রাখা দায়। নিত্যসেবা আছে। তার জন্য ভোগরাগের ব্যবস্থা চাই! সব মিলিয়ে ভাবনা তো আছেই! তবু মহানন্দ চৌধুরী বলে—

পূর্বপুরুষরা নিঃস্ব রেখে যায় নি বাবা মাকে, দেখবে এই মহলের নিচেই তাঁরা প্রচুর সম্পদ রেখে গেছেন, একদিন সব হাতে আসবে। তখন আবার দিন বদলাবে।

ওই গুপ্তধনের নেশাটা যেন মহানন্দ চৌধুরীকে পেয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে রাত্রি গভীরে সে সিন্দুক খুলে পুরোনো তুলোট কাগজের লম্বা ছকপত্র বের করে কি সব অঙ্ক কষে, ম্যাপ আঁকে।

সেবার তো চোরকুঠরীর নীচের মেজেকে সাবল দিয়ে খোঁড়াও হয়েছিল কিছুটা, তারপর আর কাজ এগোয় নি। কোন বড় ওস্তাদ এসে পড়েছিল দেবগ্রামে। তার কাছে ন্যাড়া বেঁধে আবার রেওয়াজ শুরু করে মহানন্দ চৌধুরী।

স্ত্রী মারা যাবার পর থেকেই চৌধুরী মশায়ের জীবনের সব সুর যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। আর আয়ব্যয়ও কমে আসে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলো তবু ভালো ঘরে। কিন্তু বাসনাও স্বামীকে অকালে হারিয়ে শূন্যহাতে বাবার এখানেই ফিরে এসেছে।

একটার পর একটা আঘাত মহানন্দ চৌধুরীর জীবনে এসেছে।

দেবগ্রামের পরিবেশটাও বদলে গেছে, এখন এসেছে অন্য এক যুগ। কোনমতে বেঁচে ছিল লোকটা। সব সুর স্তব্ধ হয়ে গেছে এখন।

কিন্তু আজ সকালে বাবাকে আবার এস্রাজ বের করে সুর তুলতে দেখে মনে মনে খুশী হয় বাসনা। চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো সে।

মহানন্দ চৌধুরী বলে—

ভজনকে বলে দে একবার দেবকণ্ঠকে খবর দিক। বুঝলি বাসনা, কাল গাইল বটে ছোকরা। হাজার হাজার মানুষকে থ' বানিয়ে শোনালো—আশাবরী, রামকেলি, মল্লার, বসন্ত বাহারের সুরে বন্দেজী গান। অবশ্যি আলাপটা জমাতে হয়েছিল, কিন্তু যেমন তরকিব তেমনি চুটতান। বুঝলি, এসব জিনিস হারিয়ে যায় না। দিন

বদলের সঙ্গে এর রূপবদল তো হবেই। ছোকরা তাই দেখালো কাল যাত্রার আসরে।

বাসনা বড় একটা বের হয় না, তবু কাল কলকাতার দল শুনেই গিয়েছিল যাত্রার আসরে, আর শুনেছিল সেই ছেলেটির গান। বহুদিন পর ওই আশাবরীর সুরে যেন তার হারানো মায়ের কথা মনে পড়ে। মল্লারের করুণ আবেদনে ফুটে ওঠে এই নির্জন নির্বান্ধব ধ্বংসপুরীর আকাশে কালো মেঘ-ছায়া, সব হারিয়ে বাসনাও এমনি করে কাঁদে। নিঃস্ব একটি মেয়ে। বসন্ত আর আসবে না তার জীবনে...সব ফুল-ফোটানোর পালা ফুরিয়ে গেছে তার জীবনে। তাই ওই বসন্ত বাহারের সুরেলা মূর্ছনায় বাসনার চোখ ছাপিয়ে জল নামে।

বাসনা তবু দেখেছিল কাল রাত্রির আসরে একটি মেয়ের জ্বালাভরা চাহনি। যে এই রাজকন্যার ভূমিকায় অভিনয় করছিল, সেই মেয়েটির অভিনয়ের চরিত্র ছাপিয়ে ব্যক্তিসত্তার দুর্বার জ্বালা আর কাঠিন্য চোখে পড়েছিল। মেয়ের চোখে অন্য মেয়ের মনে একজনের প্রতি ঘৃণা অবজ্ঞা এগুলো নজর এড়ায় না।

হয়তো তাদের জীবনে তেমনি ঘৃণার কোন অবকাশ রয়ে গেছে, তবু সব ছাপিয়ে বাসনার মনে ওই সুর তার জীবনের বহু স্মৃতিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল।

বাবার কথায় বাসনা বলে—

আবার এসময় কাকাবাবুকে ডাকতে যাবে? উনি তো বৈকালে আসেন।

হঠাৎ এমনি সময়ে বাইরের বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ শুনে চাইল মহানন্দ চৌধুরী।

বাইরের লোকজন এখন এদিকে বিশেষ কেউ আসে না। এখন তাদের আনাগোণা শুরু হয়েছে হারান আদক জানকী পাল মশায়ের গদিতে। ওখানেই গ্রামের অনেকে জোটে। চায়ের আসর বসায়

হারান আদক তার আধুনিক ফ্যাসানে তৈরী বৈঠকখানায়। সোফা সেটও এসেছে, আর সদর থেকে মিস্ত্রী আনিয়ে ঘরের মেঝেতে মোজাইকও করানো হয়েছে।

আর তরুণদের আড্ডা বসে বিনোদ আদকের ওখানে। পিতৃদেব হারান আদক এখনও কিছুটা কৃপণ রয়ে গেছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী সে করে না। এদিকে তস্যপুত্র বিনোদ বেশ 'দিলদরাজ' ছেলে। সুতরাং মাছির দল ওখানেই মধুর লোভে গিয়ে জোটে।

আজকের মানুষ অতীতের জমিদার বাড়ির পথ ভুলে গেছে। এখানে ওদের কেউ একটা আসে না। তাই অসময়ে ওই রামু লখিয়াকে রীতিমত শোভাযাত্রা করে ললিতকে নিয়ে ঢুকতে দেখে চাইল।

ললিত দেখছে চারিদিক। এককালের বৈভব এখন বিত্তহীনতার চিহ্ন সর্বাঙ্গে মেখে বসে আছে। ধ্বসে পড়ছে বাড়িটা। এই দিকটা কিছুটা মেরামত করানো দরকার, তাও হয় নি।

সুরটা কানে আসে তার. আশাবরীর নিখুঁত আলাপ। সকালের প্রথম আলো-ছায়ায় এই ধ্বংসপুরীতে সুরটা যেন গুমরে ওঠে।

রামু চাপাস্বরে বলে—বড়বাবু বহুৎ ইজ্জতদার খাস খানদান কা আদমী। গানা বাজানা ভি প্যার করে।

—কে!

রামুদের পিছনে কালকের রাতের সেই তরুণীটিকে দেখে একটু অবাক হয় মহানন্দ চৌধুরী।

বাসনাও দেখছে ওকে। ঘুমজড়ানো মুখচোখে নিষ্পাপ চাহনি, বয়স অনেক কম। কাল আসরের সাজপোশাক পরার আর মেকআপ থাকার জন্য বয়সটা ঠিক ঠাওর করতে পারেনি কেউ!

ওর দিকে চেয়ে থাকে বাসনা। ললিতও দেখছে বাসনাকে।

হঠাৎ খেয়াল হতে বিব্রত বোধ করে সরে গেল থামের ওদিকে। এবাড়ির মেয়েদের মনে বোধ হয় অলিখিত নিয়মেই এই স্বাতন্ত্র্য বোধ রয়ে গেছে।

রামু বলে—

বাবুজী ওই যাত্রারদলের নোকরী ছেড়ে দিয়েছে হুজুর, তাই যাত্রার দলের লোকজন চলে যেতে এখানে একলা পড়ে রয়েছে। না খানা—না থাকার আস্তানা, তাই বাবুজীকে আপনার কাছে লিয়ে এলম।

লখিয়া বলে ওঠে—

ঘর সাফা করতে গিয়ে হামি দেখলো—কোই নেহি। উ লোক বাবুজীকে ছোড় কর সব কোই ভেগে গেল।

মহানন্দ চৌধুরী দেখছে ললিতকে। ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে মহানন্দ চৌধুরীর পৈতা বার হয়ে পড়েছে। সৌম্য ওই ভদ্রলোকটি সুরের জগতে তন্ময় হয়ে ছিল! ললিত এগিয়ে এসে ওকে প্রণাম করে।

মহানন্দবাবু শুধায় ওকে—তাহলে এখন কি করবে? কলকাতায় ফিরে যাবে?

ললিত কি ভাবছে। কলকাতার জীবনে তার কোন মোহ নেই। সব স্বপ্ন যেন তার হারিয়ে গেছে। দেখেছে কলকাতায় তাদের বাড়ির সেই পরিবেশ। দাদা বৌদি সব গ্রাস করতে চায়। বাবার চিন্তা তার জন্যই। ওসব সইতে পারেনি। তাই সরে এসেছিল ললিত। তার জন্য রয়েছে শুধু অশান্তি আর অভিযোগ! বাবা বলবেন হয়তো—

—কারখানায় চল। কাজ কম্মো দেখে নিবি।

কিন্তু ললিতের জীবনের পথ আলাদা। কলকাতার ওই ইটকাঠের জীবন থেকে পল্লীর এই নিভৃত সবুজে এসে সে আজ নোতুন এক সম্পদের সন্ধান পেয়েছে। ললিত বলে—

—এখানে যদি আশ্রয় কোথাও পাই, থেকে যাবো। কলকাতায় কোন ঠাঁই নেই।

মহানন্দ ওর দিকে চাইল। ওর কথায় অবাক হয়েছে সে। থামের আড়াল থেকে বাসনাও ওকে দেখছে। কলকাতার মোহ ছেড়ে কেউ এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে চাইবে, তা জানা ছিল না। তাই বাসনা একটু অবাক হয়ে ওকে দেখছে।

ললিত বলে—এখানের ঘরোয়ানার গান শুনেছি, আজও দু'একজন এখানে তেমন গুণী শিল্পী আছেন, যদি কোথাও আশ্রয় পাই তাঁর কাছে তালিম নিতাম।

মহানন্দ চৌধুরী হারানো দিনের কথা ভাবছে। সেদিন রায় চৌধুরীদের বিরাট অতিথিশালায় বহু লোক ঠাঁই পেত, খাবারও ব্যবস্থা ছিল। আজ সেখানে একটা পাঠশালা বসে। জবর দখল হয়ে গেছে অতিথিশালা। বাবুদের আতিথ্য আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তবু লখিয়া বলে—জাগা তো হ্যায় বাবুজী।

রামুর ভালো লেগে গেছে ললিতকে। সে নিজে বেধড়ক ঢোলক পিটে হোরী কাজরী, রামধুন গেয়ে নিজেকেও একজন তাবত শিল্পী মনে করে। তাই শিল্পী ললিতকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে সে শোনায়—

—জরুর। বহুৎ জাগা হায় হুজুর। বলেন তো আমাদের ওদিকের কামরাটা সাফ করে দিই বাবুজীর জন্য। চার পাই হাম দেগা।

মহানন্দবাবু কি ভাবছে। মনে হয় একটা লোকের জন্য খাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বলে ওঠে মহানন্দবাবু—

ঠিক আছে। তাই করে দে। আর তুই পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আন মন্দির থেকে। বলবি আমি ডাকছি।

ললিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন—বসো, দাঁড়িয়ে রইলে যে। ওরে লখিয়া—ভিতরে গিয়ে এক কাপ চা কিছু খাবার দিতে বল।

গয়াগতি ভট্‌চায মন্দিরের পুরোনো লোক। এখন তার আয়ও সীমিত, মেজাজ তাই বিগড়ে থাকে। অসময়ে বাবুর ডাক শুনে বিরক্ত হয়। শীর্ণ পাকানো চেহারা। নারকেলের মালার মত মাথায় পুরুষ্ট একটা শিখা, মন্দিরে এসে ভোগরাগের আয়োজন করছে। চৌধুরীবাবুদের বিগ্রহ সেবার ভার এখন তার ওপরই।

এককালে বাবুরা নিজেরা গিন্নিমা'রা মন্দিরে আসতো রোজ। নানা উপাচার ভোগরাগ হতো। আর গয়াগতির আমদানীও মন্দ হতো না। টাকা—ছোট খাটো টিকলি, আংটি—সোনার তুলসী—এসব আসতো, আর ভোগের বরাদ্দ তেল, ঘি, আটা, চিনি, গোবিন্দ ভোগ চাল, মশলা ইত্যাদি যা আসতো, তাতে মন্দিরে দেবতার হয়েও গয়াগতির সংসারও সচ্ছলভাবেই চলে যেতো।

আজ মন্দিরের দেবতার বরাদ্দ মাত্র রোজ দশ টাকার মত, তাতেই চালাতে হয়। আর চাল কিছু মেলে। ভোগের বৈচিত্র্য—আমদানী-পত্র কমে গেছে। বাবুরাও ফৌত, দেবতাও এবার পথ খুঁজছে অন্যত্র যাবার।

গয়াগতিও চেষ্টা করছে, হারান আদক মশায়ের বাড়িতে যদি রাঁধুনী বামুনের চাকরিটা পায়, ওখানেই চলে যাবে। ওই হারান আদক এখন টাকার কুমীর। অবশ্য দেবসেবার জ্ঞান ওদের নেই। নিজেরাই সেবা পেলে ওরা খুশী। গয়াগতির গিন্নীও এখন বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বলে সে—

—ওখানের কথা ছেড়ে দাও। খুব হয়েছে দেবসেবায়। ওই তো পেসাদের ছিরি, আর মাইনে তো মোটে দশ টাকা।

গয়াগতি কথাটা ভাবছে। ছেড়েই দেবে এ চাকরী।

এমন সময় রামুর ডাক শুনে গয়াগতি ফেটে পড়ে।

—হুজুর ডাকছে—তা আমাকে কি করতে হবে?

রামু মৌজসে খৈনী টিপছিল, মেজাজটা খুশ হয়ে আছে। তার

হাবেলিতে থাকবে খানদানী গাইয়ে। ছোট তরফ সেজ তরফের ওখানে তার দেশওয়ালী ভাই বেরাদার অনেকেই থাকে। তাদের দলে গানের পাল্লাও হয়। রামুর দল এবার জিতবেই।

রামু খৈনীর গুঁড়োটায় ছুটো রাম থাপ্পড় মারতে শুখা চূর্ণ তামাকের গুঁড়ো গিয়ে সেঁদিয়েছে ওই গয়াগতির খাড়া মত নাকের গহ্বরে, আর ওর টিকটিকির মত দেহটা খিচুনির চোটে ধনুক বাঁকা হয়ে হাঁচির প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ে।

—হ্যাঁচ্চো!

রামু প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। খৈনী থাপড়ে চলেছে আর গয়াগতির শীর্ণ দেহ পাক খেয়ে বিকট শব্দে ফেটে পড়ে—হ্যাঁচচো!

হ্যাচ্ছো—হাঁচ্চো!

গয়াগতি নাক মুখ টিপে ধরে ভোগমন্দিরের বাইরে এসে তখনও হাঁচ্ছে!

রামু অবাক হয়—আরে এ ঠাকুর মোশা, এ ঠাকুর মোশা!

কোন রকমে সামলে নিয়ে গয়াগতি বের হয়ে এল!

মহানন্দবাবুর এখানে এসে ওর কথাটা শুনে আবার যেন কাহিল হয়ে পড়ার উপক্রম ঘটে। গয়াগতি দেখছে ললিতকে। মহানন্দবাবু বলে—

—মন্দিরে তো আড়াই সের চালের অন্ন ভোগ হয়। তার থেকে একে প্রসাদ কিছু দেবে ঠাকুর মশায়। একজন ব্রাহ্মণের ছেলে। এখানে গানের তালিম নেবে দেবকণ্ঠবাবুর কাছে। আর আমাদের দেউড়ির পাশের ঘরে থাকবে। ছুপুরে রাত্রে মন্দিরের চাট্টি প্রসাদ পাবে। ওখানেই ব্যবস্থা করে দেবে!

গয়াগতি ঘাবড়ে যায়।

এই চাল সব সে রাঁধে না, কোনরকমে নমোনমো করে সারে

ভোগ আর পূজার অনুষ্ঠান। হঠাৎ তাতে আবার একজন ভাগীদার জুটতে দেখে বিরক্ত হয় সে।

তবু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে পারে না। কোনরকমে জানায়—

কিন্তু বাবুর অসুবিধা হবে না? মানে নিরামিষ্যি তো, উনি আবার কলকাতার যাত্রাপাটির লোক, মাছ মাংস, মানে আমিষ খাওয়ার অব্যেস। এ সব কি সইবে?

ললিত বলে ওঠে—

না, না। ওসব অভ্যাস আমার আছে। কোন অসুবিধে হবে না ঠাকুরমশাই। দেবতার প্রসাদ পাবো, এ তো মহা ভাগ্যের কথা।

গয়াগতি কটমট করে চেয়ে দেখছে ওই বিচ্ছু ছেলেটিকে।

লখিয়া দেখেছে ওস্তাদজীর থাকার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তাই বলে রামুকে—

—তব চলো, ওস্তাদের মালপত্র লে চলো উধার।

বাসনা দেখছিল ললিতকে। ওর চেহারা দেখে মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে, কিন্তু ওই ধ্বংসপুরীতে—আতপ চালের ভাত আর গয়াগতির তেলবিহীন জাবনা খেয়ে থাকবে কি করে তাই ভাবছে। কোথায় যেন ছেলেটির মনে একটা দৃঢ়তা প্রতিবাদের জ্বালা ফুটে উঠেছে।

ললিত বের হয়ে আসছে—হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়তে বাসনাকে তার দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতে দেখে মাথা নামালো।

ওর নীরব চাহনিতে ফুটে উঠেছে একটা কৌতূহল। হয়তো প্রশ্নই—ওই বিরাট প্রাসাদের অন্তরালে বন্দী মেয়েটিকে দেখছে ললিত।

ওরা যেন অন্য জগতের মানুষ।

মহানন্দবাবু বলে—

দেবকণ্ঠ বৈকালে আসবে এখানে। তুমিও তখন এসো। কথা হবে ললিত।

ললিত মহানন্দবাবুর কথায় ঘাড় নেড়ে কোনমতে বের হয়ে এল। ওর মনে হয় পিছনে তখনও সেই বিচিত্র মেয়েটির চাহনি তাকে বিঁধছে।

গয়াগতি মুখে কিছু না বললেও মনে মনে যে খুশী হয়নি, সেটা ললিতও বুঝতে পারে।

ললিত ভাবতে পারেনি যে এত সহজে এক কথায় এখানে তার থাকা-খাওয়ার সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। মনে মনে সে লখিয়া রামুর উপরও কৃতজ্ঞ হয়।

বলে সে—তোমরা না থাকলে এখানে থাকা খাওয়া জুটতো না লখিয়া।

লখিয়া বলে—এইতো কথা। ছোটি সে বাত ওস্তাদজী—আবে রামু, চল তু। ওস্তাদকা কামরা ঠিক কর দেনে হোগা!

রামুর সকালে নেশাটা একটু দরকার। কিন্তু ওস্তাদজীর সামনে বলার সাহস নেই। চনমন করে সে! লখিয়াই ব্যাপারটা বুঝে গর্জে ওঠে!

—সুবে সুবে দারু পিবি তো জান্ খতরা করে দিব ঃ সমঝালেন বাবুজী, উ রামু হারামী একনম্বর সরাবী আছে। ওটাকে দুরস্ত করতে পারবেন?

ললিত হাসছে।

রামু বলে—এ্যাই চোপ্ বে! দারু পিব না। চল!

তাদের মহল্লায় ওস্তাদজীকে তারা এনেছে। তাই এই দায় দায়িত্ব যেন তাদেরই। রামু আর তার চ্যালারা এর মধ্যে ঝাড়ু দিয়ে ঘরটা সাফ করেছে, মায় কোদাল দিয়ে সামনের আগাছাগুলোকে কেটে

পরিষ্কার করেছে। এখন বেশ ছিমছাম লাগে। রামুর ভাতিজা সুবিয়া কোথা থেকে কিছু চূণ এনে এর মধ্যে কলি ফিরোতে শুরু করে। বাজারে রং মিস্ত্রীর কাজ করে কোন ঠিকাদারের কাছে। সেখান থেকেই চূণ এনে কলি করছে।

চারপাইও এসে গেছে, বাবুদের বাড়ি থেকে এসেছে সতরঞ্চিও।

ললিত বলে—বিছানাপত্র তো আমার হোল্ডলেই রয়েছে। ওইসব পেতে নেব।

রামু বলে—আরে পানি কা সোরাই লে আও! কলসীও এসেছে, মায় গ্লাশ সমেত।

লখিয়া দাঁড়িয়ে থেকে সব বন্দোবস্ত করছে। হাঁকডাক করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নতুন কলি ফেরানো ওই ঘরে তার গৃহ প্রবেশ করিয়ে দিল ওরা ঘটা করে।

ললিতও অবাক হয়—কিরে লখিয়া, তোকে দেখছি সত্যিই কাজের মেয়ে! একেবারে সব ব্যবস্থা পাকা।

লখিয়া বলে—

—আপনার মত বড় খানদানী আদমী থাকবেন। ওসব করতে হবে না? লিন বাবুজী, আভি নাহা লিজিয়ে। দিঘীমে সান্নান করে আসুন। আমি আপনাকে পয়লা দিন মন্দিরে লিয়ে যাবো। খেয়ে আসবেন।

লখিয়ার কাছে সব খবরই থাকে। বলে সে—

—উ গয়াগতি ঠাকোর শ্লা বহুৎ হারামী আছে, দেওতার ভোগ পরসাদ সব পুরা লিয়ে যায়। আমি না গেলে আপনাকে আধা পেট খাইয়ে উ শ্লা বাহমন্ ভেগে যাবে। যান, তালাওমে নাহা লিজিয়ে।

এককালে বিরাট রমরমা ছিল এদের, তা বুঝেছে ললিত। মহানন্দ-বাবুদের আজ ভগ্নদশা। বড় বাড়ির থামের আড়ালে এক নজরে দেখেছিল মেয়েটিকে। রূপবতী একটি মেয়ে—বিষণ্ণ নম্র চেহারা।

কিন্তু সেই চেহারায় দেখেছে ললিত আভিজাত্যের ছাপ। আর বড় বাড়িটা দেখেও তাই মনে হয়।

মন্দির নাটমন্দির ঘিরে দরদালান ঝুলবারান্দা। এককালে নাট-মন্দিরে কীর্তন গান হতো। দর্শকদের বসার জায়গা চারিদিকে। ওদিকে ছিল ভোগমন্দির, আরও অনেক কিছুই।

আজ সেখানে নেমেছে স্তব্ধতা।

শুধু গোলা পায়রার রাজ্য, মন্দিরের দেবতারও জৌলুস নেই। রূপোর সিংহাসনটা নিরাভরণ নিঃস্বতার মাঝে যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই বিরাজ করছে।

গয়াগতির মনমেজাজ মোটেই ভালো নেই।

এবার তার সামান্য রোজগারেও ভাগ বসাতে জুটে গেছে ওই ছোকরা। কিছু চাল ডাল অন্য জিনিসপত্র এমনিই সরিয়ে রাখতো গয়াগতি, তার সংসারে যেতো। আর দেবতার ভোগ দিতো আধসের-টাক চালের মাত্র। রাত্রে শীতলের লুচি করতো সামান্যই, একটু মোহন ভোগ।

এখন ঝামেলা বেড়ে গেছে!

লখিয়ার সঙ্গে ললিতকে আসতে দেখে গয়াগতি চাইল। বেশ চড়া মেজাজেই বলে—

—এখনও ভোগরাগ হয় নি!

লখিয়া বলে—ওমা! অ ভটচায মোশা, গাঁয়ের তামাম লোকের খাওয়া হয়ে গেলো, এখনও দেওতাকে ভুখা রেখেছো মাইরী! খাওয়াবে কখন? সাঁঝ বেলায়?

গয়াগতি ধমকে ওঠে—থাম তো! তুই কি বুঝিসরে ভোগের!

হাসছে লখিয়া।

—সচ্! তুমি গোঙা পণ্ডিত আছো ভটচায! তা হ্যাঁ—ওস্তাদকে

ঠিকসে খাইয়ো। হম্ পিছু খবর লিব! অব চলে—ওস্তাদজী, বসে যান—

গয়াগতি বলে—তুই যা দিকি। আমি দেখছি! বড়বাবু চাল দিয়েছেন, সব হবে। ও এল আবার খবরদারী করতে!

ললিত বলে—না-না। পথ চিনিনা, তাই পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল।

ভটচায বলে—বসেন একটু, দেখছি।

গয়াগতির অন্নেই যে ভাগ বসিয়েছে, এটা খেতে বসে বুঝতে পারে ললিত। লখিয়া বলে গয়াগতিকে—

বড়া ওস্তাদ কলাকার, ঠিকসে খেতে দেবে ঠাকুর মশাই, নাতো বাবু গোস্‌সা হলে বড়বাবু ভি বিগড়ে যাবে।

গয়াগতি খিঁচিয়ে ওঠে—ঠাকুরের রান্না তো ওই। যা হয় তাই দেব। এতো কি কালিয়া পোলাও রাঁধবো তোর বাবুর জন্যে। যা তো তুই।

ললিতও বুঝেছে ব্যাপারটা। বোদামুখ করে গয়াগতি ওকে একটা কলাপাতায় প্রসাদ দিয়েছে।

আতপান্ন—একটু শাক ভাজা, শুকনো বেগুন ভাজা—পাতলা ডাল, কিসের তরকারী আর টকের ঝোল। ওই মাত্র।

তবু খাওয়ার পর ললিতও উঠে হাত মুখ ধুয়ে গয়াগতিকে বলে—বেশ চমৎকার রান্না হয়েছে ঠাকুর মশাই। হ্যাঁ এটা রাখুন—

ললিতও নিরুপায় হয়েই এখানে খাচ্ছে, তাই ব্যাপারটাকে একটু ধাতস্থ করে নিয়েই সেও মতলবটা বের করে। গয়াগতি মুখ বোদা করে খাবার দিয়ে এবার ললিতের দিকে চাইল। ললিত পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা বের করে। লখিয়াও নেই। ললিত তাই দশ টাকার নোট এগিয়ে দেয় ওর দিকে। গয়াগতি আমতা আমতা করে—মানে ওটা—ওটা কেন?

হাসে ললিত।

ওটা রাখুন। মাঝে মাঝে খরচা কিছু নেবেন। নাহলে—বিনা প্রণামীতে প্রসাদ পেলে কি পুণ্য হবে বলুন ?

এইবার হাসতে থাকে গয়াগতি। তা মাঝে মাঝে কিছু দশ-পাঁচ টাকা আমদানী হলে ভালোই। বেশ পুষিয়ে যাবে তার। গয়াগতি টাকাটা কোঁচড়ে বেশ মজবুত করে গুঁজে বলে—

—আপনারা গুণী ব্যক্তি। বুঝছেন তো সবই। সবই ওই দেবতার দয়া। তু'চার দিন থাকলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। আজ খেতে বেশ অসুবিধে হ'ল।

হাসে ললিত।

—না না। দেবতা যদি এসব খেতে পারেন—মানুষ কেন পারবে না বলুন। ভালোই খেলাম।

গয়াগতি হাসতে থাকে। ওর শীর্ণ মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

কথাটা এর মধ্যে দেবগ্রামের বাজারেও প্রচার হয়ে গেছে। যাত্রার দলের সেই নামকরা গাইয়ে ছোকরা এককথায় এমন দাপটের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেবগ্রামে রয়ে গেছে, ওই মহানন্দবাবুদের দেউড়ির একটা এঁদো ঘরে পড়ে থাকে আর মন্দিরেই চাট্টি প্রসাদ পায় তুবেলা।

বিনোদ আদক ইদানীং এখানে একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তুলেছে। অবশ্য বুদ্ধিটা হারানবাবুরই।

টাকা সে নানা ভাবে অনেক রোজকার করে, বড় বড় কনট্রাক্ট, এ দিগরের সব ধান গম সরষের মহাজন সেই-ই। পাট-এর কারবারও আছে।

তাছাড়া সদর থেকে পারমিটও আসে তার, লোহা লক্কড় সিমেণ্টের সে এই এলাকার হোল-সেলার। ধানকল একটা আইসক্রীম কলও করেছে বিনোদ, তাছাড়া এই এলাকার যাতায়াতের পথ বলতে কিছু

বাস, আগে ছিল একটা পুরোনো মডেলের ঝড়ঝড়ে শেভ্রলে গাড়ি। সর্বাঙ্গ তার নারকেল কাতা দিয়ে জড়ানো। খোয়াচালা রাস্তায়—ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দিনান্তে একটা ওই বিচিত্র অযান্ত্রিক যেতো সদরের দিকে।

এখন অবস্থা কিছু বদলেছে। আরও পিচের রাস্তা হচ্ছে এদিকের জংশন ইস্টিশান সাঁইথিয়ার দিকে। গ্রামের রূপ বদলাচ্ছে, তাই সাংস্কৃতিক ব্যাপারটাও হাতে রাখা দরকার। এতে করে সদরের কর্তাদের নজরে আসা যায় চট করে, তাই হারানের যোগ্য সন্তান বিনোদও সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছে এখন। এই ভাবে কর্তাদের নজরে এসে হারান আদক তস্যপুত্র বিনোদ আদক উঠে পড়ে লেগেছে এর বাস রুটগুলো দখল করতে

বিনোদ এবার আরও পরিচিতি চায়। সিনেমা হাউস-এর চেষ্টা হচ্ছে; বিনোদের সাঙ্গপাঙ্গও জুটে গেছে। বিষ্টুপদই খবরটা আনে এই আড্ডায়।

একজন শিল্পী এসেছে দেবগ্রামে আর ঠাঁই না পেয়ে উঠেছে ওই সাপখোপ-এর রাজ্যের একটা ভাঙা ঘরে, দিন কাটাচ্ছে ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ খেয়ে। এটা যেন তাদেরই ভাবতে খারাপ লাগে।

বিনোদ বলে—সেদিন জব্বর গেয়েছিল ছেলেটা। তা হঠাৎ এখানে রয়ে গেল কেন? ব্যাপারটা কি রে?

ভবনাথ এক-আধটু গান বাজনা করে। দেবকণ্ঠবাবুর বাড়িতে যাতায়াত আছে। ভবনাথ বলে—

শুনলাম, ছেলেটা দেবকণ্ঠবাবুর কাছে নাড়া বেঁধে তালিম নিচ্ছে।

—এ্যাঁ!

বিনোদ রীতিমত চমকে উঠেছে। দেবকণ্ঠবাবুর গান সে শুনেছে। বিনোদের ভালো লাগে না।

লোকটা যে কি গায় তা কে জানে।

বিনোদ বলে ওঠে :

—ওর কাছে গান শেখার জন্য এই অজ পাড়াগাঁয়ে রয়ে গেল ছেলেটা ?

ভবনাথ বলে—ওখানে যায় দেখেছি।

বিনোদের চোখ ছোট হয়ে আসে। দেবকণ্ঠবাবুর মেয়ে গৌরীকে ভালো করেই চেনে সে। দেখেছে কিছুই আর নেই দেবকণ্ঠের।

তবু মেয়েটা দেখতে-শুনতে ছিমছাম, গানও মন্দ গায় না। তাই এত দ্যামাক, বিনোদের সঙ্গে কথাও বলে না। ওকে এড়িয়ে যায়। রাগ অপমানটা বিনোদের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

মনে হয় কোথাও একটা গোলমাল রয়ে গেছে। এ মাটির নায়ক হয়েও এত প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে বিনোদ গৌরীর কাছে এগোতে পারে নি। কিন্তু দুদিন এখানে এসে ওই ছেলেটা গৌরীর কাছেই যেন ঠাঁই পেয়েছে মনে হয়, আর তার জন্যই যাত্রার দলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে. এখানে গান শেখার ভান করে পড়ে আছে। বিনোদ যেন কোথায় নিদারুণভাবে হেরে গেছে। সারামন জ্বলে ওঠে এই পরাজয়ের খবরে।

বিষ্টুপদ এলেমদার লোক। ও জানে বিনোদের দুঃখটা কোথায়।

ইদানীং দেখেছে বিষ্টুপদ বিনোদকে জিপ নিয়ে না হয় পায়ে হেঁটেই দু'একদিন গৌরীদের ওদিকে যেতে। সেদিন সে নিজে শুনেছে গৌরীর কথাগুলো। বিনোদকে যেন পাত্তাই দিতে চায় না মেয়েটা। বিষ্টুও চটে উঠেছিল। আজ ওই শিল্পীর থাকার ব্যাপারে সেও কিছু সন্দেহ করে। বলে সে—

আমি বের করবো ছোটবাবু। শালা যাত্রাওয়ালা এসে দেবগ্রামের মাটিতে লাঠি ঘুরিয়ে যাবে, এ হবে না। কেন পড়ে আছে এখানে তা আমি বুঝি না! শিকেরি বিড়েলের গোঁফ দেখলে চিনতে পারি। বিষ্টুপদর চোখে ধুলো দেবে, সে ব্যাটা এখনও মায়ের গর্ভে।

বিনোদ ওর কথায় একটু আশ্বস্ত হয় মনে মনে। তবু নিজেকে সে ধরা দিতে চায় না। তাই বলে—

কি বলছিস যা তা। গুণী লোকের কাছে কিছু গান-এর তালিম নেবার জন্যই রয়ে গেছে। হয়তো! তা থাকুক না!

হাসে শিবু।

—তাহলে ভবার কাছেই শিখতে আসতো। ভবনাথ তো এখন এ-জেলার মধ্যে সেরা গাইয়ে। কি গো ভবদা?

ভবনাথ এখন বিনোদ আদকের সভাগায়ক গোছের।

ভবনাথ ছেলেবেলা থেকেই একটু বেপরোয়া। নানা গুণে সে বিভূষিত। তখন থেকেই চোলাই ধান্যেশ্বরীতে ডুবে থাকতো! এ অঞ্চলের ধান ওঠার পর সুরু হয় মেলা। ওই মেলাগুলো এক ঠাঁই থেকে পালা শেষ করে যায় অন্যত্র। এই ক'মাস ধরে বীরভূম—মুর্শিদাবাদ বর্ধমান জেলার সীমান্ত ঘুরে ঘুরে ওদের পরিক্রমা চলে।

ভবনাথও তখন থেকেই মেলায় ঝুমুর দলের সঙ্গে ভিড়ে যেতো ঘর ছেড়ে পাড়ি দিতো তাদের সঙ্গে রাঢ়বাংলার পথে প্রান্তরে।

কখনও লেটোর দলের বাঁধনদার হয়ে তাদের নাচিয়ে মোহিনীদের সঙ্গে আশনাই করতো আকণ্ঠ ধেনো মদ গিলে, নাহয় ঝুমুর দলের মেয়েদের নাগর সেজে কটা মাস ঘুরে বেড়ায় মেলায় মেলায় বাঁধনদার গাইয়ে হিসেবে।

ভবনাথ তখন থেকেই গান গাইতো। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। ভবনাথের বাবা কাকারা এ গ্রামের পুরোনো বাসিন্দা দেবসেবা—যজমান-বৃত্তি এসব নিয়েই থাকতো। এখনও তার কাকা ওই গয়াগতি ভট্টাচার্য তাই নিয়েই রয়েছে।

ভবনাথের বাবা প্রথম দিকে বাধা দেয় নি। তখন দেবকণ্ঠ বাবুর নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। তার কাছে গান শেখার জন্য অনেকেই আসতো দূর দূরান্তর থেকে। জমিদার বাড়ি

অতিথি শালায় থাকতো। দেবকণ্ঠের তখন খুব নাম ডাক, ভবনাথের বাবা ভেবেছিল তার ছেলেরও নামডাক হবে। অর্থাগম হবে। তাই দেবকণ্ঠের কাছে গান শেখার ব্যাপারে উৎসাহই দিয়েছিল। অনেক উৎসাহ নিয়ে তখন প্রথম দিকে ভবনাথও দেবকণ্ঠের কাছে গান শিখতো, গলাটি মিষ্টি আর সুরেলা ছিল। দেবকণ্ঠবাবু বলতো—

মন দিয়ে রেওয়াজ কর ভব, তোর হবে। এমন গলা সকলে পায় না। তবে খাটতে হবে।

তাই মন দিয়ে শেখাতো দেবকণ্ঠ। আশা ছিল তার ভবনাথ তার নাম রাখবে।

কিন্তু তা হয় নি।

ভবনাথ তখন থেকেই নানা দলে পড়ে মদ ধরেছিল, আর ক্রমশ তার মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে সেদিন দেবকণ্ঠ বাবুই ওর হাত থেকে তানপুরা কেড়ে নিয়ে লাথি মেরে তাকে তার বাড়ি থেকে দূর করে দিয়ে বলেছিল :

—ঐসব যন্ত্রে আর হাত দিস না। তোর মত ছোটলোকদের জন্য পাপীদের জন্য এ পথ নয়! এখানে আর আসিস না। দূর হয়ে যা ভব!

…সেই থেকে ভবনাথও নিজেই ওই ঝুমুর মেলায় লেটোর দলেই ভিড়েছে।

তা কখনও গ্রামের যাত্রার দলেও বিবেকের গান গায়, আর মদ গিলে পড়ে থাকে।

ইদানীং ভবনাথ তাই বিনোদের এখানে আসে। তবু বিনোদের খোসামুদি করে মদের খরচা পায়, আর বিনোদকেও এখন এই দ্রব্যের স্বাদ পাইয়ে তাকেও এই তন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলেছে।

ভবনাথ ওদের সভানায়ক।

ভবনাথও শুনেছে কথাটা, আর সেই রাত্রে যাত্রার আসরে সেও

ওই ছেলেটার গান শুনেছে। সকাল থেকেই ভবনাথ বিনোদের দয়া চায়ের বদলে এখানে চোলাই মদ গেলে। বেশ তৈরী হয়েছি ভবনাথ। আর তার চেয়ে নামী গাইয়ে কেউ নেই।

তাই ওদের গানের কথা শুনে ভবনাথ বলে ওঠে।

—য্যামন দেবকণ্ঠ আর তেমনি তার চ্যালা। ও দেবকণ্ঠ নয় বাবা, রাসভ কণ্ঠ আর চ্যালাটি বায়স কণ্ঠ। দাঁড় কাক।

ভবনাথ অতীতের সেই অপমানটা আজও ভোলেনি। ওই মহানন্দবাবুদের দরদালানে সেবার বাইরে থেকে কোন গাইয়ে এসেছেন। তার আর দেবকণ্ঠ বাবুর গান হবে। তার চেলাদের দু'একজনও গাইবে।

ভবনাথ-এর গানের কথাও বলেছেন তিনি।

আসর বসেছে। কিন্তু ভবনাথের তখনও দেখা নেই। ভবনাথ তখন গোপী বাগান মেলায় ঝুমুর দলের মূল গায়িকা বিমলির ওখানে আড্ডায় বসেছে

বিমলির টসটসে চেহারা মদের নেশায় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দু'চোখে তার মাদকতা। ভবনাথ ওর গায়ে হাত রেখে ঠুংরীর একটা তান করে।

বিমলি হাসে—কি গাও মাইরী! একদিন শোনাও! ভবনাথের খেয়াল হয় তার আজকের গানের কথা। তখন নেশাটা সবে জমেছে। এদিকে গান-এর আসরেও যেতে হবে। ওকে উঠতে দেখে বিমলি বলে।

—কোথায় চল্লে নাগর ?

ভবনাথের দু'চোখে নেশার ঘোর। পা টলছে। বলে ভবনাথ—রাতের বেলায় আসবো মাইরী। এখন একটু ঘুরে আসি!

এদিকে আসর সুরু করতে পারেনি ওরা। অপেক্ষা করছে

ভবনাথের জন্য। তার গানের পর বড় গাইয়েদের গান সুরু হবে। ওস্তাদ বলে—কণ্ঠজী আপনার চেলা কোথায় গেল?

—মহানন্দবাবুও অধৈর্য হয়ে ওঠেন। দেবকণ্ঠবাবু শুনেছেন ভবনাথের সমন্ধে দু'একটা কথা, বিশ্বাস করেননি। আজ তিনি অবাক হন ভবনাথকে ঢুকতে দেখে। টলছে ভবনাথ, গায়ে মুখে বিশ্রী গন্ধ। চমকে উঠেছে সকলেই। ভবনাথ এসে বলে জড়িত কণ্ঠে!

—একটু দেরী হয়ে গেল মাইরী! শালী বিমলিই দেরী করিয়ে দিল।

তানপুরাটা সে টেনে নিতে যাবে, দেবকণ্ঠবাবু যন্ত্রটা সরিয়ে নিয়ে বলে—তুমি উঠে যাও ভবনাথ। এ অবস্থায় কোনদিন আর আসরে আসবে না। আর গান শিখতে এসোনা আমার কাছে। এ আমারই লজ্জা। যাও, দূর হয়ে যাও।

ভবনাথ চীৎকার করে—মাইরী। ইয়ার্কি পেয়েছো—গাইবই। ওকে মহানন্দবাবুই বের করে দিয়েছিল দারোয়ান দিয়ে।

সেই থেকে ভবনাথ আর যায়নি দেবকণ্ঠের ওখানে। কিন্তু রয়ে গেছে সেই রাগটা। এর জবাব সে দেবেই। শোধ নিতে হবে তাকে যেভাবে হোক।

ভবনাথ বলে—একবার দেখে নোব ওই দেবকণ্ঠকে।

—সামনে পেলে এক আসরে ওকে শুইয়ে দেবার এলেম রাখে এই ভবনাথ ভট্টাচার্য।

-

বিষ্টুপদ মনে মনে কথাটা ভাবছে।

শান্ত জনপদে মাঝে মাঝে ওরা কিছুটা উত্তেজনার ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়ে এখানে সোরগোল তোলে। বিষ্টুপদ বলে।

—তা সত্যি ছোটবাবু, বলে না, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তাই হয়েছে ভবার। আর দুদিন এসে ওই যাত্রাওলা ছোঁড়া কিনা শিরোপা

নিয়ে ঘুরছে দেবগ্রামের পথে ঘাটে! এখানে যেন ওস্তাদ নেই গাইয়ে নেই। কেন ভবা কি মরে গেছে?

ভবনাথ মালের ঘোরে বিড়বিড় করে, হঠাৎ ওই ইজ্জৎ-এর কথায় মাতাল ভবা এবার চেতিয়ে উঠে বলে—তাই বল তোরা।

বিষ্টুপদ বলে—একদিন লড়িয়ে দাও মাইরী ওই নোতুন ছোঁড়াটার সঙ্গে।

ভবাও হাঁক পাড়ে—জরুর!

বিনোদের চোখের সামনে গৌরীর মুখখানার ছবি ফুটে ওঠে। শান্ত সুন্দর মেয়েটাকে যেন হারাতে হয়েছে তাকে। ওই ললিতের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। এ হতে দিতে পারে না বিনোদ। একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

ললিতকে দরকার হলে যেভাবে হোক এই দেবগ্রাম থেকে সরে যেতে বাধ্য করাবে সে।

বিনোদকে সকালের আড্ডা ছেড়ে উঠতে হচ্ছে। কাজ আছে। হঠাৎ কাকে দেখে চাইল বিনোদ। তার ড্রইংরুমটা পথের ধারে, সামনে বিনোদ একটু বাগানও করেছে। ওদিকে বাজারের এলাকা। এখন দেবগ্রামে দৈনিক বাজার বসে।

বিনোদ বারান্দা থেকেই লখিয়াকে দেখেছে। তার রূপ-যৌবন এখনও টসকায় নি। আর মুখের লালিত্য ছাপিয়ে লখিয়ার জিবের ধার ঝক-ঝকিয়ে ওঠে। বিনোদের কথাটা মনে পড়ে। ওই ছেলেটি রয়েছে। দেউড়ির পাশেই ওদের আস্তানার কাছে।

বিনোদ ডাকছে ওকে—এ্যাই লখিয়া, শোন।

লখিয়া চেনে বিনোদবাবুকে। ওর সন্ধানী চোখে ফুটে ওঠে বিনোদবাবুর আসল পরিচয়টা। কিন্তু ধূর্ত মেয়েটা জানে, এখন বাজারে রামুর দোকান, বিনোদবাবুকে চটানো ঠিক হবে না। আর লখিয়াও চায় এদের যদি কোন খবর থাকে সেগুলো জানতে। তাই

ধূর্ত মেয়েটাও বিনোদ আর চ্যালাদের দেখে একটু ঠাটে চমক তুলে এগিয়ে আসে। সে চেনে এই ভবনাথ-বিনোদকে। লোকটা মহা বদ। মালের জন্য যায় ভবনাথও, তাই মনের জ্বালাটা চেপে রেখে লখিয়া বলে।

—জলদি বলো ছোটবাবু কি বলবে। দের হয়ে গেল।

বিনোদ বলে—এত তাড়া কিসের? রামুর দোকান ক্যামন চলছে?

লখিয়া চাইল ছোটবাবুর দিকে। হঠাৎ রামুর জন্য এত দরদ দেখে মেয়েটা একটু অবাক হয়। সে বলে—আপনাদের মেহেরবানীতে চলছে একরকোম বাবুজী।

বিনোদ বলে ওঠে।

—যাবো একদিন তোদের ওদিকে। তা হ্যাঁরে নোতুন ওস্তাদের সঙ্গে চেনা জানা হ'ল তোদের?

লখিয়া বুঝেছে আসল দুঃখটা কোথায়। ধূর্ত মেয়েটা এবার চোখে মুখে লহর তুলে সারা দেহ-রেখাগুলোকে মাদকতায় সোচ্চার করে বলে—

না। উ তো কণ্ঠোজীর বাড়িতেই রেওয়াজ করে। আর ঘরে থাকলে দরোজা বনধো করে তা না না করে। তাজ্জব আদমী। ও আমাকেও ভি দেখে না। মালুম দুসরা জায়গায় নজর পড়েছে বাবুজী। আমাদের দিকে নজর দেবে কেনে? হামি তো পরদেশীন কাহার না!

বিনোদ যেন মেয়েটার জন্য দুঃখ বোধ করে। তার লোভ মেয়েদের ওপরই। সেখানে ছোটজাত বড়জাত-এর ফারাক নেই।

বিনোদ বলে—ভারি আমার ওস্তাদ! তাই তোর ওখানে যাবো একদিন। ব্যাটা কেমন ওস্তাদ দেখে আসতে হবে।

—ওস্তাদ!—লখিয়া সরল ভঙ্গীতে বলে—ছাই! কেবল দামাক। চলি ছোটবাবু! আসবেন মেহেরবানী হলে।

মেয়েটা চলে গেল। বিনোদ তখনও ওর যৌবনের ঢলনামা দেহের দিকে চেয়ে থাকে। ওর সারা দেহে যেন বর্ষার ময়ুরাক্ষীর ঢল নেমেছে। হঠাৎ ভবনাথের কথায় চাইল বিনোদ।

—লাটখান কিন্তু খাসা ছোটবাবু। ওস্তাদ তোমার গাছেরও খাচ্ছে শ্লা তলারও কুড়োচ্ছে। ওদিকে গৌরী এদিকে লখিয়া! লে লুটে লে বাবা!

বিনোদ জবাব দিল না।

ললিত দেবগ্রামে আশ্রয় পেয়েছে ওই ধ্বংসপুরীতে। বিচিত্র এক পরিবেশ। যেন হারানো অতীতের কোন যুগে ফিরে গেছে সে এখানে এসে। চারিদিকে ভাঙ্গা প্রাসাদের রাজ্য। হারানো অতীতের স্তব্ধতার বুকে এসে ললিত ক'দিন যেন নোতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছে।

ক'দিন রয়েছে এখানে ললিত। দেবকণ্ঠবাবু ক'দিন সদরে গেছেন, তাই দেখা হয় নি! একাই এখানে ঘুরে বেড়ায় এই ধ্বংসপুরীর পথে!

নাহয় রামু লখিয়াদের আসরের হুল্লোড় শোনে!

বৈকালে যায় মহানন্দবাবুর ওখানে। মাঝে মাঝে মহানন্দবাবু এস্রাজে বাজায় কোন রাগ রাগিণী, গলা দেয় ললিত। বৃদ্ধ মহানন্দ রায় চৌধুরী যেন একজন সঙ্গীকে পেয়েছে। দেবকণ্ঠবাবু ক'দিন নেই। বৈকালে মহানন্দবাবু কোথাও বের হয় না। দেবকণ্ঠবাবুও যায় না অন্যত্র।

দুজনে এসে বসে হারানো অতীতের মধ্যে।

সেখানে আজ বসেছে ললিত। মহানন্দবাবু বলে।

—কালই ফিরবে দেবু! কইরে বাসনা, চা-টা দে আমাদের। ললিত কখন এসেছে।

হাসে ললিত—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

মহানন্দবাবু শুধোয়—তা খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে না তো ওখানে?

বাসনা চা নিয়ে আসছিল, শুনেছে সে কথাটা। জানে বাসনা, মন্দিরে কি ভোগ হয়। কিন্তু অবাক হয়। ললিতের কোন দ্বিধা অতৃপ্তি নেই! ললিত বলে।

—না, কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

বাসনা ওর কথায় চাইল, বোঝে বাসনা ওর অসুবিধা হলেও সে জানাবে না। ললিতের ব্যাপারে সেও বিস্মিত হয়। মহানন্দবাবু অবশ্য তার বাড়ির সম্বন্ধে কোন কথাই শুধান না।

আবার দুজনে সুরের রাজ্যে ডুবে যায়।

—আহীর ভৈরোর একটা মুখড়া আলাপ করছে ললিত!

মহানন্দবাবু বলে—

দেবকণ্ঠ শুনলে খুশী হবে ললিত। এমন একজন ছাত্র তার কাছে তালিম নেবার জন্য সর্বস্ব ছেড়ে বসে আছে এখানে, সেই-ই জানলো না!

ললিত বলে—সর্বস্ব আমার কিছুই নেই, ছাড়ার কথাও তাই ওঠে না। যাযাবরই বলতে পারেন।

বাসনা ওর কথাটা শোনে! কিন্তু ওই চেহারা—ভদ্র বিনয়ী ভাব দেখে বার বার বাসনার সন্দেহ হয়, ললিতের সম্বন্ধে। কোথায় যেন ওই ছেলেটির জীবনে একটা বেদনাই রয়ে গেছে, সেই বেদনা সুর হয়ে ঝরে পড়ে ওর গানে।

এই নিঃসঙ্গতা নির্জনতা বেদনা দেবকণ্ঠবাবুর জীবনেও রয়ে গেছে।

দেবকণ্ঠবাবু বৈকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু আসে এখানেই। গ্রামের বাজার-গঞ্জের দিকে যেতে মন চায় না। দেবকণ্ঠবাবুর মনে হয় কোথায় যেন হেরে গেছে সে। আর সেই পরাজিত মুখটা বাইরে দেখাতেও লজ্জা করে। তাই বাইরে থেকে ফিরেও অন্যত্র যায় নি।

নিজেও জীবনের সুযোগগুলোকে সেদিন অবজ্ঞাভরে হারিয়েছে। ক্রমশ দিন যে এমনিভাবে আমুল বদলে যাবে তা ভাবে নি।

গৌরীও বড় হয়ে উঠেছে। স্ত্রী মারা গেছে দেবকণ্ঠের—অনেক আগেই। সেদিন দেবকণ্ঠবাবুর চোখে ছিল অন্য জগতের নেশা, দূরের রাজ্যে হারানো একটি মানুষ সেদিন তার ঘর-সংসারে স্ত্রীকেও দেখে নি।

গৌরী দেখেছে বাবার সংসারের প্রতি এই অনীহা। মা অসুস্থ, গ্রামের ডাক্তারবাবুও বলেন।

—সদরে না হয় কলকাতাতেও আপনার অনেক চেনা জানা, দেববাবু ওকে বরং কলকাতায় নিয়ে একবার ভালো করে দেখিয়ে আসুন।

দেবকণ্ঠ তখন এলাহাবাদ কনফারেন্সে গাইতে যাবার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। দিন-ভোর রেওয়াজ করছে। বলে দেবকণ্ঠ।

—ওখানের ফ্যাংশান শেষ করে, এসে নিয়ে যাবো।

গৌরী মাকে দেখেছে চুপ করে ভুগতে। কোন দাবী নেই—কোন অভিযোগও নেই। ছোট মেয়েটা বলে মাকে।

—তুমিও বাবাকে বলো মা! কলকাতায় নিয়ে যাক তোমায়।

দয়াময়ী মেয়ের দিকে চাইল! রোগজীর্ণ মুখে ফুটে ওঠে বিষণ্ণ হাসির করুণ আভা। বলে ওঠে দয়াময়ী—ওকে ওর কাজ নিয়ে থাকতে দে গৌরী। সামনে এলাহাবাদে কনফারেন্স। ওখান থেকে আসুক আগে, তারপর যাবো কলকাতায়।

গৌরী অবাক হয়—এসময় বাবাকে যেতে দেবে? তোমার এতবড় অসুখ?

মেয়ের কথায় ওর দিকে চাইল দয়াময়ী। মেয়েও যেন বাবার ওই সাধনাকে পছন্দ করে না।

কিন্তু দয়াময়ী কোনদিনই দেবকণ্ঠের সাধনায় বাধা দেয় নি। ও জানে, আজ সত্যিই সে অসুস্থ। তবু দয়াময়ী বলে—ওকে বাধা এতদিন দিই নি গৌরী! ওকে বলে কোন লাভ নেই।

গৌরীও ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে সেটা।

বাবা চলে গেছে এলাহাবাদে, সেই সময়েই মাও মারা গেল। গৌরী দেখেছিল ওই সর্বনাশ। মা তার বিনা চিকিৎসাতেই মারা গেছে। আর বাবা সেই গানের রাজ্যেই রয়ে গেছে।

...মানুষটার ওপর একটা নীরব প্রতিবাদমুখর মন নিয়েই এই গ্রামের সংকীর্ণ পরিবেশে দিন কাটায় সে। আর বাবার সেই নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ভোলার জন্যই গান-এর চর্চা করে।

...ক্রমশ গৌরীর দেহে মনে এসেছে পরিবর্তন, দিন বদলের সঙ্গে গৌরীর ভিতর বাইরের মনে দেহে একটা নোতুন চেতনার আবির্ভাব ঘটেছে।

দেখেছে এ গ্রামের ওই বিনোদ—তার দলবলের প্রতিষ্ঠা। তাদের সম্মানের আসনটা কোথায় হারিয়ে গেছে। গৌরীর মনে হয় সেও এখান থেকে চলে যাবে। শহরে।

না হয় কলকাতায় একটা আশ্রয় পেলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। গান সে ভালোই গায়, কিন্তু এই গ্রামের পরিসরে তার গানের কোন দামই নেই তা বুঝেছে। যত বুঝেছে সেই কঠিন সত্যটা, ততই সারা মনের জ্বালাটা বেড়ে ওঠে। ওকে যেন বন্দী করে রেখেছে ওই দেবকণ্ঠবাবু এখানের জগতে।

তাই হয়তো মাঝে মাঝে গৌরীর সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে প্রতিবাদে মুখর হতে চায়।

গৌরীর কাছে বাবার এই সহনশীলতাটা মনে হয়েছে দুর্বলতা। আর একালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে সে পারেনি তাই হয়তো হেরে গেছে দেবকণ্ঠ।

এটা যে আংশিক সত্যতা সেও বুঝেছে এই দু-একদিন আগেই। গৌরীও যাত্রার আসরে গিয়েছিল, ললিতের গানও শুনেছে, মার্গ সঙ্গীতই। রাগ রাগিণীর উপর মূল ভিত্তি তাদের গানের। কিন্তু

নীরস তান কর্তন, চক্রধর দুরূহ লয়কারী গমক-এর গর্জন এসবের চেয়ে তাতে আছে সুরের স্পর্শ, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই পরিবর্তিত রূপটা গ্রামের হাজারো মানুষ মন দিয়ে শুনেছে, তৃপ্তি পেয়েছে।

গৌরীর মনে হয় তার বাবা সেই সঙ্গীতকে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য থেকে সর্বজন গ্রাহ্য হৃদয়ের স্পর্শমদির সুরের ধারায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মানুষের রুচি বদলের এই তথ্যটিকে না জেনে সেকালের সুর বিস্তারের পথ দিয়েই চলেছে। দোষ সেই মার্গ সঙ্গীতের নয়, দিনবদলের সঙ্গে রূপ বদলের অক্ষমতার।

গৌরী বাবাকে কথাটা জানাতে তিনি বলেন।

—এ ঠিক নয়।

হাসে গৌরী—তাহলে বাবা, আজ যে ঢংএ মীরার ভজন গান দিলীপ রায়, আর ওঙ্কার নাথ ঠাকুর, আসলে মীরাবাঈ সেযুগে নিশ্চয়ই এই ঢংএ গাইতেন না। আসলে সুরের গানের—ভাবের ভিতরের তত্ত্ব ঠিক যদি ফুটিয়ে তোলা যায়, গান তখনই সার্থক হয়ে ওঠে। নীরস ব্যাকরণ জানার মধ্য দিয়ে নয়।

দেবকণ্ঠ চাইল মেয়ের দিকে।

ক'দিন দেবকণ্ঠ গেছে সদরে। গৌরী একাই বাড়িতে রয়েছে। হঠাৎ সেদিন মহিম দাসকে জিপ নিয়ে আসতে দেখে একটু অবাক হয়।

মহিম দাস সদরের নামী কারবারী লোক, কদট্রাকটার। বাবার বন্ধু। মহিমবাবু ব্যবসাপত্র করলেও একটু সংস্কৃতিবান মানুষ। সহরের অনেক কাযেই থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তিনি। তাই দেবকণ্ঠের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা আছে।

গৌরী মহিমবাবুকে দেখে জানায়—বাবা তো নেই, ক'দিনের জন্য বাইরে গেছেন।

মহিমবাবু দাওয়ায় মোড়াটা টেনে বসে বলেন।

—যাবার চেয়ে দরকার তোমার কাছেই গৌরী! তা দেবুদা নেই কথাটা তাকেও জানানো দরকার। সে না হয় ওর সঙ্গে পরে দেখা করে জানাবো। এখন তোমাকেই বলে যাই।

মহিমবাবুই খবরটা তাকে শোনায়।

সহরে তারা একটা বিরাট সঙ্গীত অনুষ্ঠান করছেন, সরকারও চান —তাঁরাও এটা চান যে কলকাতার নামী-দামী শিল্পীদের সঙ্গে এখানের শিল্পীদের অনুষ্ঠানও পরিবেশন করবেন। যাতে তাঁরা সকলেই জানতে পারেন এদের যোগ্যতার খবর।

এইভাবে এখানের শিল্পীদেরও বৃহত্তর জনসমাজে পরিচিতি দিতে চান তারা!

মহিমবাবু বলেন—কলকাতা থেকে অনেকেই আসছেন, প্রেসের লোক মায় আকাশবাণীর লোকও আসছে, স্থানীয় শিল্পীদের কিছু অনুষ্ঠান তারা রেকর্ড করবেন। আমি চাই গৌরী এই অনুষ্ঠানে তুমিও গাইবে! হয়তো বাইরে তোমার পরিচিত হবার এটা একটা সুযোগ। তোমার প্রতিভা আছে, ভালো গাইতে পারো, তবে এ সুযোগ কেন নেবে না! আর আমরা তোমাকে গাইবার জন্য যোগ্য মর্য্যাদাও দেব।

গৌরী ভাবছে কথাটা।

এতকাল ধরে সেও বৃহত্তর জগতে গাইবার পথ খুঁজছিল। এভাবে গ্রামে পড়ে পড়ে সে শেষ হতে পারবে না। সেই সুযোগ আজ যেচে এসেছে।

গৌরীকে ভাবতে দেখে মহিমদাস বলে।

—এত কি ভাবছো? তুমি গাইবে, আমি নামও দিয়েছি। পাবলিসিটিও বের হচ্ছে!

গৌরী বলে—বাবাকে একবার বলা দরকার। আমার অমত নেই কাকাবাবু, তবু বাবার মতামতের প্রশ্ন রয়ে গেছে।

মহিমদাস বলে—এর জন্য ভেবনা। দেবুদাকে আমি বুঝিয়ে বলে সব ব্যবস্থা করে নেব, আজই সদরে ফিরছি, ওখানে যদি দেখা হয় জানাবো কথাটা। নাহলে একদিন যোগাযোগ করে নেব। তোমার প্রোগ্রাম করে নিলাম।

মহিমবাবু কাযের লোক। বসার সময় তার নেই। তাই ঝড়ের বেগে কথাটা জানিয়ে বের হয়ে গেলেন।

গৌরী ভাবনায় পড়ে। তবু এতবড় সুযোগও ছাড়তে রাজী নয়। সেও চায় তার গান শুনুক অনেকে। তার প্রতিভার মূল্যায়ন হোক।

দেবকণ্ঠবাবু ফিরতে গৌরীই কথাটা জানায়। বলে সে—জোর করেই মত নিয়ে গেল বাবা, বল্লেন মহিমকাকা তোমার সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

মহিমকে ভালোই চেনে দেবকণ্ঠবাবু। তার একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গেও পরিচিত সে। জানে, সাধারণ মানুষের জন্য এমনি অনুষ্ঠান ওরা করে, গৌরীকে সেখানেই গাইতে হবে।

গৌরীর কথায় দেবকণ্ঠ বলে—ওই চুটকি গানের আসরে গাইতে যাবি তুই! বাজে সব ব্যাপার।

বাবার কথাটা আজ সহজে গৌরী মেনে নিতে পারে না। সে জানে বাবার এই ধারণাগুলো পুরোনো। আজ চলে না।

গৌরী বাবার কথায় বলে ওঠে একটু কঠিন গলায়।

—তোমার কাছে সবই বাজে। শুধু কাজের তোমার ওই গান। দিন বদলেছে তাই তোমার গান কেউ শোনে না। ওসব অচল হয়ে গেছে।

দেবকণ্ঠ চমকে ওঠে। সারা জীবনের সাধনাকে তারই মেয়ে এমনি নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করতে পারে তা জানা ছিল না। দেবকণ্ঠ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

—কি বলছিস গৌরী! সারা জীবন এই নিয়ে কাটালাম—আজ বলছিস এসব অচল! বাজে!

গৌরীর পুঞ্জীভূত জ্বালাটা এবার যেন ফেটে পড়তে চায়। ও বলে—নয়তো কি। কি পেয়েছো জীবনভোর? মা মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়, সবকিছু হারিয়ে পেয়েছো শুধু অভাব আর জ্বালা। মাকেও শেষ করেছো—এবার আমার পালা। আমাকেও এমনি বন্দী করে রেখে তিলে তিলে শেষ করতে চাও তোমার ওই বন্দেজী গানের অজুহাতে!

—গৌরী!

দেবকণ্ঠ কঠিন আঘাতে যেন কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে। গৌরী আজ জ্বলে উঠেছে। তার মুক্তির সব পথগুলোকে তার বাবা নিজের হাতে যেন বন্ধ করে রেখেছে। গৌরী বলে ওঠে কান্নাভেজা স্বরে।

—ঠিকই বলছি। তুমি মানুষ নও, পাথর। তাই দেখেও কিছু দেখতে পাও না।

...কি রুদ্ধ কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে গৌরী। দেবকণ্ঠ বিবর্ণ মুখে ওর দিকে চেয়ে থাকে।

...বৈকালের আলোটুকু মুছে মুছে যাচ্ছে।

দেবকণ্ঠ এবার জীবনের বেদনার্ত করুণ একটা দিককে দেখেছে গৌরীর মধ্যে। এই শান্ত পাখী ডাকা পরিবেশ, বাতাসে মেশা বকুল গন্ধ—জীবনের প্রশান্তির ব্যর্থ আশ্বাস নিয়ে ঘর বাঁধা—বেঁচে থাকার স্বপ্নটা কঠিন মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে আজ।

বৈকালের রোদের বিবর্ণতায় ফুটে ওঠে. সারা মনের গ্লানি আর হতাশার ছায়া, একটি দিনের বিদায় বেদনা আজ একটি ব্যর্থ জীবনের গ্লানিতে থমথমে হয়ে ওঠে।

দেবকণ্ঠের কোথাও যাবার ঠাঁই নেই। একজনের কাছে সে

জানাতে পারে তার জীবনের এই চরম বেদনার কথা। আজ তার একমাত্র নির্ভর গৌরীও যেন চরম আঘাত দিয়েছে দেবকণ্ঠকে। দেবকণ্ঠ এমনি আঘাতের আশা করেনি ওর কাছ থেকে। একথা সবাইকে বলা যায় না।

মহানন্দ চৌধুরীদের এদিকেই আসছে দেবকণ্ঠ। চারিদিকে ধ্বংসপুরী। মনে হয় দেবকণ্ঠের সব ঘরই এমনি করে ভেঙে যায়, অনেক আশা-কামনার পরিসমাপ্তি ঘটে এমনি ধ্বংসপুরীর নৈরাজ্যে। কোন আশা নেই কোথাও।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো দেবকণ্ঠ। ওই স্তব্ধ ধ্বংসপুরীর মধ্যে একটা সুর ওঠে। সাধা গলায় বন্দেজী ঠুংরীর সুর। পুরো মেজাজ নিয়ে এমনি বিষণ্ণ অপরাহ্ণে সুরটা ছড়িয়ে পড়ে এখানের আকাশে বাতাসে, এক দুঃসহ বেদনায়।

—বাবুল মেরে নৈহার

ছুট্‌কে যায়।

...ঘরও ভেঙে যায়, সেই সব হারানোর বেদনা ছড়িয়ে পড়ে সুরে সুরে।

বহুদিন পর এই ধ্বংসপুরীতে আবার সুর ফিরে এসেছে। এককালে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বাইজীরা আসতো, আসতো অনেক গুণী শিল্পী। সারেঙ্গীর সুরে ছড়িয়ে পড়তো সুরের তরকিফ। সব হারিয়ে গেছল। হঠাৎ এখানে সেই বন্দিশের সুর শুনে দেবকণ্ঠ চমকে উঠেছে। স্বর ভাঙার বেদনা যেন গুমরে ওঠে ওই সুরে। জীবনের অনেক পাওয়ার মাঝে শূন্যতার চিরন্তন হাহাকারময় ওই সুর। কোথায় দেবকণ্ঠের অন্তরের বেদনায় তা রঙীন হয়ে উঠেছে।

চার কাহার ও

লে যায় ডোলি—

মৃত্যুর শ্যামস্নিগ্ধ রূপ—জীবনের করুণ পরিণতির ছবিটাই ফুটে ঠে। সব কিছুর শেষ নয়, এ যেন এক নব শোভাযাত্রা। চারজন াহার সেই চতুর্দোলা বয়ে নিয়ে চলেছে—

…সুরটা দেবকণ্ঠের গলা থেকে নিখুঁত পর্দায় এক আর্তি নিয়ে টে ওঠে। ওই তরুণের গলার সুরে মিশেছে প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী দবকণ্ঠের সুর। দুটি সুর এক হয়ে স্তব্ধ ধ্বংসপুরীর বুকে কি মোহময় ারিবেশ রচনা করে।

ললিত অবাক হয়।

বৈকালে কি খেয়ালেই সে এই ভাঙা ঘরটায় রেওয়াজ করছিল। ওই ঠুংরীর সুর তুলছিল। হঠাৎ তার সুরে ওই মহান শিল্পীর সুর এসে মশেছে। ললিত ভাবতে পারে নি, যার কাছে তালিম নেবার জন্য স এখানে এই সব কষ্ট সহ্য করে পড়ে আছে সেই দেবকণ্ঠ নিজে থাকবেন তার এই জীর্ণ ঘরে। এ যেন তার স্বপ্নেরও অতীত।

ললিত চেয়ে থাকে ওর দিকে বিস্মিত চাহনি মেলে।

সুরটা যেন আহত পাখীর মত কি আর্তি নিয়ে আকাশে মিশে যাচ্ছে। ললিতও সুর থামায় নি। সে গলা মিশিয়েছে ওই সুরে।

মহানন্দ চৌধুরী বৈকালে বাড়ীর সামনের বাগানে একটু পায়চারী করে। বৈকালের মুখেই সূর্য বড় বড় বাড়িগুলোর আড়ালে পড়ে যায়—তাই এখানে নামে নির্জন বিষণ্ণ সন্ধ্যার আভাস। দীঘির ধারে দেওদারু গাছের পাতায় বাতাসের সুর ওঠে। ঘরে ফেরা পাখীগুলোর কলরব ছাপিয়ে হঠাৎ ওই সুরটা উঠছে বাতাসে, অপরূপ একটি শ্রুতি।

চমকে ওঠে মহানন্দ চৌধুরী, বহুদিন এখানের পরিবেশ থেকে ওই সুর হারিয়ে গেছে। আজ হঠাৎ তাই ওই বন্দেজী সুর শুনে মহানন্দ চৌধুরী একটু অবাক হয়, যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভরা সেই সমৃদ্ধময় দিনগুলোর ছবি ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে সজ্জনবাঈ-এর ভৈরবী ঠুংরীর বন্দিশ।

—বাজু বন্ধ খুলু খুলু যায়।

যৌবনের উন্মাদনার বৈচিত্র্যভরা কত মুহূর্ত তার মনে স্বপ্ন নিয়ে আসে।

এই সুরের উৎসের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষটি, অতীতের যৌবনের দিনে সেই স্মৃতির রাজ্যে সে ফিরে চলেছে। মহানন্দ চৌধুরী চলেছে জীর্ণ বাড়িটার দিকে।

...ওই রুদ্ধ কারায় বন্দী বাসনা, বৈকালে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে, এখানের স্তব্ধতার মাঝে ওই সুরটা তার সারা মনে যেন ঝড় এনেছে। হাহাকার ছাপিয়ে ওঠে বাসনার জীবনে ওই সুরের বেদনায়।

এদিকের ঘরে ঢুকে মহানন্দ অবাক হয়, ভাঙা ঘরের জীর্ণ মেজেতে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে ললিত আলাপ করছে। দেবকণ্ঠও এসে গলা মিলিয়েছে। ওই জীর্ণ গুমোট ঘরটা যেন এক সুরের মায়ায় ভরে উঠেছে। মহানন্দ চৌধুরীও এসে দাঁড়ালো ওদের সুরের ঝর্ণাতলায়।

বাবুল মেরে নৈহার

ছুটকে যায়—

...সাবাস ললিত! বাহ্-বাহ্ বাঃ—

মহানন্দ চৌধুরীর গলার স্বরে ওরা চমকে ওঠে। সুরটা থেমে যায়। দেবকণ্ঠের খেয়াল হয় হঠাৎ কি যেন একটা আনন্দ আর তৃপ্তিতে তার জ্বালাভরা মনটা ভরে উঠেছে। আজ বহুদিন পর সে প্রাণভরে গান গেয়েছে নিজের অন্তরের তাগিদে।

ললিত চাইল মহানন্দবাবুর দিকে।

মহানন্দ বলে—এর কথাই বলছিলাম দেবকণ্ঠ। সব ছেড়েছুড়ে

ানেই রয়ে গেল তোমার কাছে তালিম নেবে বলে। তা কেমন ধলে ছাত্রটিকে ? চলবে ?

দেবকণ্ঠ অবাক হয়—সব ছেড়ে-ছুড়ে এই ক্লাসিক গান শিখবে মৈ ? ওখানে তো অনেক মাইনে পেতে শুনেছি।

ললিত জানায়—তিনহাজার টাকা পেতাম মাসে।

মহানন্দবাবুও অবাক হয়। দেবকণ্ঠ কি ভেবে বললে—গানের াই।

—এত টাকার মোহ ছেড়ে দেবে ?

ললিত ভাবছে তার বাড়ির কথা। যাত্রার দলের চেয়েও বেশী াজকার করতো তাদের ব্যবসায়। গাড়িও পেতো। পেতো নিশ্চিন্ত বনের প্রশান্তি। কিন্তু সব ছেড়ে সে তার জীবনটাকে নিয়ে নিামনিই খেলতে চায়, তাতেই তার আনন্দ।

নিজে সে ।শল্পী, তাই শিল্পের জন্যই সে সব ছেড়েছে।

টাকার লোভ মোহও তার নেই। ও যেন যাযাবর, শুধু পথে াবার আনন্দেই আর দেখার তৃপ্তির বিনিময়ে সব হারাতে রাজী।

আজ ললিত তাই টাকার মোহকে তুচ্ছ করে আবার অন্য এক নে এগোতে চায়।

ললিত দেবকণ্ঠের কথায় বলে—টাকার লোভ আমার নেই। ারও কম।

দেবকণ্ঠ দেখছে জীর্ণ ঘরের তক্তপোষে বসে থাকা ছেলেটিকে। খেমুখে ওর কি ব্যাকুলতা। নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে তার মতই াব আর দারিদ্র্যের মাঝেই এগিয়ে আসতে চায় কি পাবার নন্দে।

লখিয়া মেয়েটার নজর সব দিকেই। সেও শুনছিল বাবুজীর । রামু গেছে বাজারে। লখিয়া হঠাৎ ওই ওস্তাদজীকে এসে তে দেখে অবাক হয়েছে, আর তারপরই এসে হাজির হয়েছে

বড়বাবু ওই মহানন্দবাবু নিজে। তারই আস্তানার পাশের ওই ঘরা বসে ওরা গানে ডুবে গেছে।

লখিয়ার মনে হয় তাদের বাবুজী কমতি লোক নয়। না হ ওই তাবড় লোকগুলো এভাবে এখানে এর আগে কখনও আসে নি

লখিয়ার দুটো গরুর দুধ হয়, অবশ্য দুধটা সে কয়েকটা বাড়ি মাসকাবারী বরাদ্দে রোজ দিয়ে আসে। আজ বাবুদের এখানে ে লখিয়া এর মধ্যে চুলো ধরিয়ে চা বানিয়েছে বেশ এলাচ তেজপ আর দুধ দিয়ে। তিনটে কাপে করে চা নিয়ে লখিয়া এগিয়ে ঘরের মধ্যে।

...বাবুজী ; চা !

মহানন্দবাবু বলে—এর মধ্যে চা-ও এনেছিস !—নাও দেবকণ্ঠ।

লখিয়াও ওদের চা যোগাতে পেরে মনে মনে খুশী হয়।

দেবকণ্ঠ কি ভাবছে। মহানন্দবাবু বলে—তা হলে লেগে প ললিত।

দেবকণ্ঠবাবু আজ বৈকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল এ বেদনাভরা মন নিয়ে, কিন্তু এখানে ওই ছেলেটির সংস্পর্শে । তার সুরের ছোঁয়ায় ফিরে পেয়েছে তার শিল্পীমনকে—যে আনা জগতে হারিয়ে যেতে চায়। দেবকণ্ঠের মনে হয় সে ফুরিয়ে যাবে তার সৃষ্টির মধ্যে সুরের মধ্যে সে নিজেকে ফিরে পায় আজ নে করে। মুখে চোখে সেই আনন্দের আভাষ। দুচোখে নামে তৃ ছায়া। ললিতও প্রণাম করে দেবকণ্ঠকে, যেন গুরু বলেই মেনে তাকে। দেবকণ্ঠ খুশী হয়—থাক, থাক। মহানন্দবাবু বলে— পছন্দ হয়েছে তো ?

দেবকণ্ঠ বলে—ঠিক আছে। দেখা যাক ঈশ্বরের কি ইচ্ছে

মহীমবাবুও দেবগ্রামের লোক। সদরে তার ফলাও কারব

গ্রামের বাড়িটার হাল ফিরিয়েছে। মহীম দাসও গ্রামে এলে
'রান আদকের ওখানে যায়।

মহীমবাবু গৌরীকে গানের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছে গৌরীর উজ্জ্বল
বিষ্যৎ-এর কথা। মহীম দাস চতুর ব্যক্তি—নানাভাবে কথার জাল
.ন সে কাজ হাসিল করতে চায়। মনে হয় মেয়েটার মনে সে একটা
ড় তুলেছে, গৌরী হয়তো যাবে তাদের অনুষ্ঠানে। আরও একজনের
থা ভেবেছে মহীম দাস।

তার জন্যই বিনোদ আজকের বৈঠকখানায় গেছে সন্ধ্যার মুখে।
নোদ এখন দেবগ্রামের সঙ্গীদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সেজেছে। আর
বনাথও এখন দু'চারজন ছাত্র নিয়ে এসময় বিনোদের ড্রইং রুমের
দিকে একটা ঘরে গানের ক্লাশ করে। অবশ্য ভবনাথ এখন গীত-
জন-বাংলা আধুনিক এইসব নিয়েই থাকে। হিন্দীও গায়।

বিনোদ বলে—লোকের যা শুনতে ভালো লাগে তাই গাইবে ভব,
ই শ্লা তা-না-না করে লোক তাড়াবার গান গেয়ো না মাইরি।

...তবলার জলদ ঠেকা বাজে, ভবনাথ বেশ রঙীন মেজাজে চুটকি
ান গাইছে।

ভবনাথ-এর গলাটা মাঝে মাঝে শুকিয়ে আসে। বিশেষ করে
ন্ধ্যার পর থেকেই ভবনাথের পুরোনো বহু কালের অতৃপ্ত তৃষ্ণাটা
:গে ওঠে। তাই ধেনো মদের দরকার।

ওটা জোটে বিনোদের দয়ায়।

বিনোদ বেশকিছু লোককে হাতে রাখার জন্য এই পথও নিয়েছে।
াই এখন বিনোদের ড্রইংরুমের সভাগায়ক ওই ভবনাথ। গলাটা
ভজিয়ে নিয়ে ভবনাথ বাবরী চুল নেড়ে আবার চুটকি তান করে
লকা গজল গাইছে। ঝোঁকের মাথায় বাবরি চুল দুলিয়ে সোম
াত্লায়।

চাপা স্বরে বাহবার শব্দ ওঠে।

মহিম দাসও গ্রামে এলে আসে এখানে। হারাণ আদকের চে বিনোদের সঙ্গেই তার দহরম মহরম বেশী। জমাটি আড্ডায় মহিমবে ঢুকতে দেখে বিনোদ বলে—এসো দাদা! শোনো ভবনাথের গা শোনো, এবার কামাল করে দেবে মাইরী!

ভবনাথও মহিম বাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে গজলের ছুট তানে ফাঁকে একবার পশ্চিমী ঢং এ মাথা ঝুঁকিয়ে আদব আরজ জানি আবার গানের মধ্যে লবকদারি ঠাট ফুটিয়ে তোলে।

বিনোদ আদক বলে—কেমন শুনছো মহিমদা। এবার বা ভবনাথকে তোমার ফাংশানে একটা চান্স দাও। এই এলাকা সেরা গাইয়ে এখন ভবনাথ ভটচার্যই, তাকে চান্স দেবেনা কেম কথা।

মোশাহেবদেরও কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—দিতেই হবে দাদা! ভবনাথ আমাদের মুখ রাখবেই। মহি দাসও কথাটা ভাবছে। কারণ বিনোদকে তারও দরকার হয় না কাযে অকাযে। তাই মহিম দাস বলে।

—দেখছি কমিটিকে বলে। জানো তো—এত শিল্পী গজা এখন যে চান্স দিয়ে শেষ করতে পারবে না। তাই কমিটির মতাম নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে!

বিষ্টুপদ বলে।

—আরে কমিটি তো তোমার পকেটে! তা ছাড়া ভবনাথ-ে মত কে আছে বলো? দেবকণ্ঠ বাবুর সব চীজ পাবে ওর মেজা ওই ভবদার কাছে।

মহিম দাসকে খুশী করার পথও জানে বিনোদ। তা ছাড়া মান অতিথি এসেছে, তার সৎকার-এর আয়োজন করতেই হবে।

বিনোদ বলে—বসো মহিমদা, ওরে রতন দাদার জন্যে কি মুরগীর টিকিয়া বানা, আর ছাখনা মাছ ভাজা কি আছে।

মহিমদাস জানে এদের আপ্যায়ণের রীতি। অবশ্য মহিমদাস ওতে অভ্যস্ত। তবু বলে সে।

—আবার ওসব কেন ?

হাসে বিষ্টুপদ—সামান্য আয়োজন কিঞ্চিৎ গ্রহন না করলে দুঃখ পাবে বিনোদ !

ওদিকে বোতলও বের হয়। ভবনাথ তখন গান থামিয়ে এবার ওই দ্রব্যগুলির দিকে চেয়ে আছে। তার চান্সও এবার বাঁধা, আর ভবনাথ দেখিয়ে দেবে যে সে কত বড় এলেমদার গাইয়ে।

মহিমদাস বলে।

—একটু ঘুরে আসছি বিনোদ, এসে যুৎ করে বসা যাবে।

বিনোদ অবাক হয়—সেকি ! ভর্তি গাজনে ঢাক ফাঁসাবে মহিমদা ? শেষ যাবে ! আর সুরু হোক তবে তো শেষের কথা ভাববে।

মহিমদাস হিসেবী লোক।

তার কাছে গৌরীর অনুষ্ঠানটাই বেশী দরকার, ওই ভবনাথের অনুষ্ঠানের চেয়েও। কারণ দেবকণ্ঠ বাবুর মেয়ে হিসেবে তার নাম ডাক হবে, আর গৌরী সত্যিই অপূর্ব গায়, দেখতেও সুন্দরী। ফলে আসরের নাম ডাক হবে সবদিক থেকেই।

কথাটা পেড়ে এসেছে, এবার সে দেবকণ্ঠ বাবুর মতটাও নিয়ে আসবে। মদ খেয়ে ওখানে গেলে কোন কাযই হবে না। তাই আগেই কাজটা সেরে আসতে চায় মহিম। বলে সে বিনোদের কথায়।

—একটু কায সেরে আসি হে ! দেবকণ্ঠ বাবুর বাড়ি যেতে হবে।

ওই নামটা শুনে ভবনাথ চুপসে যায়। বিনোদ শুধোয়।

—ওকে গাইতে নিয়ে যাবে নাকি ওই আসরে ?

মহিমদাস চাইল ওর দিকে। বলে সে।

—ওকে নয়, ওর মেয়েকেই নিয়ে যাবো ভাবছি ওই অনুষ্ঠানে।

ভবনাথ ঘাবড়ে যায়। বিনোদও ভাবছে কথাটা। ওর চোখের

সামনে গৌরীর নিটোল দেহটার ছবি ভেসে ওঠে, ওর দু'চোখের চাহনি যৌবনমদির দেহ বিনোদের মনে নেশা জাগায়।

মহিমদাস বলে—আগে দর্শনধারী পিছে গুণ বিচারি। বুঝলে না অনুষ্ঠান জমাতে হবে তো। চলি। আমি আসছি কাজ সেরেই।

বের হয়ে গেল মহিম। ভবনাথ গুম হয়ে বসে আছে। বিষ্টুপদ ওকে মদের গ্লাশটা ধরিয়ে দিয়ে বলে—পিও ওস্তাদ। আরে ভাবছে কেন? তোমার কেস স্বয়ং বিনোদবাবু টেক আপ্ করেছেন। তোমার ভয় কি। চালাও পানসী—

হৈ চৈ করে ওঠে ওরা দ্রব্যগুণের মহিমায়।

গৌরী মহীম দাসকে আসতে দেখেছে। মহীম বলে—তোমার বাবা তো ফিরেছেন এবার কথা বলে দেখো। সকালেই সদরে যাবে, বৈকালে গান বাজনা করে সন্ধ্যার পরই ফিরতে পারবে। আর ওরা প্রণামী বাবদও দুশো এক টাকা দেবে। বিরাট আসর। ডি এম সাহেবও থাকবেন। কলকাতার গণ্যমান্য অতিথিরাও থাকবে। কাগজে ছবিও বেরুবে।

গৌরী যেন স্বপ্ন দেখছে। এই বদ্ধ গ্রামের পরিবেশ থেকে সে মুক্তি পেয়েছে অন্য জগতে। কিন্তু বাবার মতামত এখন জানতে পারে নি। বাবাকে সে কথাটা জানাতে চায়।

দেবকণ্ঠবাবু বাড়ি ফিরেছে অন্যমন নিয়ে। আজ মনে হয় নিজের সংসারে গৌরীর ওপর কিছুটা আশা যা ছিল তা ফুরিয়ে গেছে। দুঃখ সে পেয়েছে।

কিন্তু ললিতকে দেখে খুশীও হয়েছে দেবকণ্ঠ। এখনও তার স্বীকৃতি রয়ে গেছে অনেকের কাছে। ললিত তাকে হারানো বৈভব ফিরিয়ে দিয়েছে আজ, এসেছে সেই স্বীকৃতি।

হঠাৎ মহীম দাসের কথাগুলো কানে আসে। দেবকণ্ঠ শুনছে কথাগুলো, গৌরী আজ কেন এতখানি অধৈর্য হয়েছিল তা কিছুটা

বুঝতে পারে দেবকণ্ঠ। মনে হয় গৌরীকে এ জগতের কিছুটা জানতে দিতে হবে, যাতে সে নিজেই তার পথ বেছে নিতে পারে।

মহিম দাসও দেখেছে দেবকণ্ঠকে ফিরতে। গৌরীও এগিয়ে আসে। দেবকণ্ঠ বাবু দেখছেন ওদের। গৌরীও চায় আজ বাইরে গান গাইতে, গৌরী বলে—মহিমকাকা আবার এসেছেন তোমার মত নিতে। গৌরীর কথাটা জানায় মহিমই। ও বলে ওঠে—দেবকণ্ঠদা, ভাবছিলাম গৌরীর একটা অনুষ্ঠানের কথা। সদরে ডি এম সাহেবও অনুরোধ করেছেন ওকে গাইতে।

দেবকণ্ঠ হাসল।

গৌরী দেখছে ওই মানুষটাকে, আজ দরকার হলে গৌরীও প্রতিবাদ করবে। কিন্তু গৌরী অবাক হয় ওর কথায়। দেবকণ্ঠ বলে ওঠে স্তব্ধ কণ্ঠে—বেশ তো। গৌরী গাইতে চায় যাক।

মহীম যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। তাই খুশি ভরে বলে।

দেরী হবে না। কাল সকালে গিয়ে বৈকালে প্রোগ্রাম করে রাত্রেই ফিরবে। আর ওরা নমস্কারী বাবদ—

দেবকণ্ঠ নিজে গান গেয়ে ওই টাকার কথা কোন দিন ভাবে নি। আজ মেয়ের গান গেয়ে টাকা আনার খবরটাও সে জানতে চায় না। তাই বলে—ওটার দরকার আমার নেই। গৌরীকেই দেবে।

দেবকণ্ঠ দাঁড়াল না, ভিতরে চলে গেল। গৌরীও অবাক হয়েছে, বাবা যে এত সহজে রাজী হবে তা ভাবে নি। মহীম দাস বলে।

—তাহলে কাল সকালেই তৈরী হয়ে থাকবে, গাড়ি নিয়ে আসবো। আর এটা রাখো।

অবাক হয় গৌরী। একখানা একশো টাকার নোট ওকে দিতে দেখে। মহীম দেখছে গৌরীর চোখ মুখের নীরব পরিবর্তনটা। জানে মহীম তার মন্ত্র ব্যর্থ হবে না।

মহীম বলে—একশো টাকা আগাম রাখো, কাল আর একশো

ওখানে পাবে। আর শিল্পীর দাম কি কেউ দিতে পারে? এটা একটা ধারা 'টোকেন', নাম মাত্র প্রণামী, নাও।

গৌরী ভাবতে পারে নি যে তার গানের দাম এতো হতে পারে, তাই খুশী হয়েছে সে।

শহরে এর আগে এসেছিল গৌরী বাবার সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে। কোন বড় মঞ্চে বাবার খেয়াল ঠুংরীর আগে সেও ভজন গেয়েছিল। আর দেখেছিল বিশেষ আমন্ত্রিত মানুষগুলোকে চুপ করে গান শুনতে, শান্ত পরিবেশে সেই গান হতো।

আজ এখানে এসে অবাক হয়েছে গৌরী। বিরক্তি এসেছিল আগেই। মহিম কাকা সব ব্যাপারটা তার কাছে বলেনি। হয় তো ইচ্ছে করেই চেপে গেছল। গাড়িতে করে আনছে গৌরীকে, ওপাড়ায় এসে গাড়ি থামিয়ে ওরা তুলেছে ভবনাথকে। ওকে দেখেই মন মেজাজ বিগড়ে গেছে গৌরীর। মহিমও একটু গুম হয়ে বসে থাকে। মহীমের গাড়িতে ভবনাথকে তুলতে দেখে চাইল গৌরী। ভবনাথ তার খুব চেনা। আগে ভবনাথ তার বাবার ছাত্র ছিল কিছুদিন। তখন থেকেই চিনেছে ওই মানুষটিকে।

ভবনাথ-এর পরণে লক্ষ্ণৌ চিকনের রঙীন কাজ করা পাঞ্জাবী, আর ধুতি, তাও বেশ ফুলের মত কোঁচানো। চোখের কোলে অত্যাচারের ফলে কালচে দাগ পড়েছে। চুলগুলো বাবরী করা। গত রাত্রিতে বিনোদের ওখানে অনেকক্ষণ অবধি মদ্যপান করেছিল, ফলে তখনও মুখে নিঃশ্বাসে দিশী মদের গন্ধ বের হচ্ছে।

পান চিবুচ্ছে চর্‌চর্‌ করে। গাড়িতে গৌরীকে দেখে ভবনাথ বলে।

—তাহলে প্রোগ্রাম করতে চললে? যাক্‌ দেবুদার সুমতি হয়েছে তালে? আরে বাবা আজকাল দিন বদলে গেছে, পাবলিশিটির

যুগ। দেখবে এবার মহীমদার নজরে পড়েছো তরতরিয়ে উঠে যাবে, কই গো মহীমদা সিগ্রেট ছাড়ো দেখি।

গৌরী চুপ করে বসে থাকে গাড়ির এক কোণে। ভবনাথ-এর চোখে মুখে দেখেছে নীরব লালসার ছাপ। বাতাসে গৌরীর শাড়ি উড়ছে। তার রুক্ষ চুলের গুছি এসে পড়ে গালের ওপর। ভবনাথ দেখছে ওকে, গৌরীও জানে ওর মনের নীরব লোভটার খবর।

মহীমবাবু তাকে বলে নি যে ভবনাথও যাবে। তাহলে গৌরী আসতো না। এখন নিজেরই খারাপ লাগে. বাবার অমতে সে নিজে জোর করে এসেছে।

শহরের একটা খেলার মাঠে প্যাণ্ডেল হয়েছে বিরাট এলাকা জুড়ে।

দেওয়ালে এখানে-ওখানে পোস্টার মারা। তাতে কলকাতার শিল্পীদের নাম ফলাও করে লেখা হয়েছে। কিন্তু গৌরী অবাক হয় তার নাম ওখানে নেই। কোন উল্লেখ নেই তাদের।

মহীমবাবুকে বলে গৌরী।

আমাদের নাম তো নেই পোস্টারে।

মহীম দাস ইদানীং শহরে অনুষ্ঠান করে কিছু দমকা রোজকারও করে চলেছে। আর এতে নাম খ্যাতিও বাড়ে ওপর মহলে। ফলে ঠিকাদারীর কাজও হাতে আসে। ব্যবসাটা চিনেছে সে।

আর গৌরীকে যে দয়া করে চান্স দিচ্ছে এ কথাটা জানাতে গিয়েও পারেনা। দেখছে মহিম, গৌরী, ভবনাথকেও উপেক্ষা করেই চলেছে নির্বিকার ভাবে।

মহিম বিরক্তি চেপে জানায়—

—ওটা আগেকার ছাপা, তাছাড়া কি জানো।

ওসব নাম দিলে টিকিট ভালো বিক্রি হয় কিনা, অবশ্য তোমার নামও ছড়াক তখন দেখবে আমরাই ছাপবো!

ভবনাথ হাসে।

তা সত্যি। ওসব নিয়ে ঘাবড়িয় না গৌরী। একবার চান্স নাও, দেখবে মহীমদার সঙ্গে কলকাতার রেকর্ড রেডিও মায় সিনেমা-ওয়ালাদের দারুণ চেনা জানা, তখন তারাই লুফে নেবে। দাম বাড়াব তখন চড় চড় করে। এ্যা!

গৌরী জবাব দিল না। ভবনাথের কথাগুলো, ওর ওই দেঁতো হাসিটা ভালো লাগে না গৌরীর। নিজেকে মনে হয় অনেক ছোটো। কোন যোগ্যতা যেন তার নেই।

আর সেই সঙ্গে গৌরীর জেদী মনও যেন কঠিন হয়ে ওঠে, তাকে যোগ্য হতেই হবে।

ভবনাথ দেখছে গৌরীকে। অনেক দিন পর ওর কাছাকাছি এসেছে আজ। আগের সেই ঘটনাটাকে ভোলেনি ভবনাথ। সেদিন গৌরীর জন্যই ভবনাথ গিয়েছিল দেবকণ্ঠের ওখানে ছাত্র সেজে তালিম নিতে। গৌরীও মিশেছিল তার সঙ্গে।

দুপুরের এক নির্জন মুহূর্তে সে গৌরীকে হঠাৎ একা পেয়ে সেদিন একটু বেশী এগোবার চেষ্টা করতে গৌরীও ফুঁসে ওঠে।

—গান শিখতে এসোছো, না বাঁদরামি করতে আসো এখানে?

ভবনাথও যেন মরীয়া হয়ে উঠেছে। গৌরীকে সেই নির্জন দুপুরে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, প্রতিবাদমুখর গৌরী রাগে অপমানে ওকে একটা চড়ই মেরে গর্জে উঠেছিল।

—বের হয়ে যাও তুমি। নাহলে বাবাকে বলে দেব।

এমনি সময় দেবকণ্ঠ বাড়ি ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো ভবনাথ। ওর চোখে মুখে লালসার কদর্য ছাপটা তখনও ফুটে ওঠে, সেটা দেবকণ্ঠের দৃষ্টি এড়ায় না। দেবকণ্ঠ স্তব্ধ চাহনিতে চেয়ে থাকে। ভবনাথ কোনরকমে সামলে নেয়।

আজ বেশ ক'বছর পর আবার কাছে পেয়েছে গৌরীকে। ভবনাথের মনে হয় আজ গৌরীও বদলে গেছে। নাহলে এই আসরে

টাকা নিয়ে গাইতে আসার নাম করে মহীম দাসের মত লোকের জালে পা দিত না। ভবনাথ চুপ করে কি ভাবছে।

দেবকণ্ঠবাবু হয় তো সত্যিই আজ পরাজিত।

নাহলে নিজের মেয়েকে পাঠাতো না ওই আসরে গাইবার জন্য। এ যেন গৌরীরও অপমান, দেবকণ্ঠেরও। ভবনাথও আজ সেটা বুঝতে পারছে। তবু কোথায় তার সারা মনে বাজে দেবকণ্ঠের পরাজয়ের এই বেদনাটা। তার মনে হয় সেও গৌরীর জন্য আজ দুঃখ বোধ করে।

শহরে এসে পৌঁচেছে ওদের গাড়িটা

মহিমদাস গৌরীকে মহিলা শিল্পীদের থাকার জন্য যে জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেখানেই তুলেছে। মেয়েদের হোষ্টেল।

কয়েকজন কলকাতার মহিলা শিল্পীও এসেছেন। ওদিকের ব্লকে রয়েছেন তাঁরা। গৌরী ওদের দু'চার জনের নাম শুনেছে। গান ও রেকর্ড—রেডিওতে ওদের গলা শোনা যায়। গৌরীও স্বপ্ন দেখছে সেও ওদের মতই নাম করবে।

গৌরী নিজের ঘরে বসে এই কথাটাই ভাবছে।

সন্ধ্যার একটু পরে মহিমবাবু এসে ওকে নিয়ে চলেছে প্যাণ্ডেলে।

সারা সহরে যেন সাড়া পড়ে গেছে। অনেক দূর থেকেই শুরু হয়েছে। দূর-দূরান্তরের যাত্রীদের নিয়ে বাস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ির ভিড়। সাইকেল রিক্সা তো আছেই। বিরাট প্যাণ্ডেলটা আলোর মালা দিয়ে সাজানো, আর অসংখ্য মানুষের ভিড় জমেছে গেটে।

মাঙ্গলিক সানাইএর সুর ওঠে।

একটু ঘাবড়ে যায় গৌরী। একা কখনও এতবড় আসরে গাইতে আসেনি। দু'চারবার যেখানেই গেয়েছে বাবা ছিলেন সঙ্গে। আর

বাবা মত দিলেও বেশ বুঝেছে গৌরী বাবা আদৌ খুশী হয় নি। বাবার অমতেই গাইতে এসেছে সে এখানে।

মহিমদাস শুধোয়—কি ভাবছো ? ভয় করছে নাকি ?

গৌরী মনে মনে বাবাকে স্মরণ করে বলে—না। দেখছি এত লোকের ভিড়।

হাসে মহিমদাস—তা হয়। আমাদের ফ্যাংশানে লোক ধরে না প্যাণ্ডেলে।

গৌরী অবশ্য ভিতরে গিয়ে ওই উদ্বেল জনতাকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। আর মঞ্চে অনুষ্ঠান চলেছে। কোন দল অর্কেষ্ট্রা বাজাচ্ছে। সেই উৎকট বাজনার তালে তালে ওই দর্শকরা পা ঠুকছে—আর তাক্ষ্ণ কণ্ঠে সিটি বাজাচ্ছে। এ যেন এক বিরাট উন্মাদ জনতার সামনে এসে পড়েছে গৌরী। ওদের রুচির সম্বন্ধে এবার ভীতি বোধ করছে গৌরী। মনে হয় সুস্থ রুচিসম্পন্ন কোন গান সুর এদের মনকে ছুঁতে পারে না। এইবার ভীত চকিত চাহনি মেলে দেখছে গৌরী চারিদিকে।

ভবনাথও এসে বসেছে প্যাণ্ডেলের ওদিকে শিল্পীদের জায়গায় তার পাশেই। ভবনাথের চোখ-মুখে ফুটে ওঠে খুশীর আবেশ। বাবরি চুল সমেত মাথা নাড়ছে সে।

গৌরী দেখছে ওই জনতাকে। বৈচিত্র্যময় এক জগৎ। চোঙা প্যাণ্ট পরা সূচলো দাড়ি গোঁফ ভরা মুখ—রং-বেরং-এর জামাপরা সঙ্গীতরসিকের দল শিস দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে রুচির অমিল নেই —সামনে আশপাশে বসা সাধারণ মেয়ে-ছেলে বয়স্ক মানুষগুলোরও। গান-এর সঙ্গে বাজনাও বাজছে রকমারি ধরনের। পিয়ানো একোর্ডিয়ান বঙ্গো—লম্বা মুখো ঢোলক গোছের—আর রকমারি সাইজের আকারের গীটার।

কোন নাম করা আধুনিক গাইয়ে কোমর দুলিয়ে নেচে গেয়ে

আসর মাৎ করে চলেছে। শ্রোতারা সিটি বাজিয়ে ওকে উৎসাহিত করে।

ভবনাথ বলে—এই হচ্ছে গান, যেন ঝড় তুলেছে। এমনি গান গাইতে শেখো গৌরী, তোমার যা রূপ যৌবন দেখবে ক্যামন জমে যায়। পার নাইট হাজার হাঁকো, তাই দেবে।

গৌরী চুপ করে থাকে। ওই আসরের বিচিত্র পরিবেশ ওই উন্মাদনাময় গান আর দর্শকদের চীৎকার সবকিছু দেখে শুনে গৌরী ভয় পেয়ে গেছে। মনে হয় গানের আসর নয়।

একদল উন্মাদ মানুষের সামনে যেন তাকে ওরা বন্দী করে এনে হাজির করেছে। চারিদিকে আগুন জ্বলছে। আদিম মানুষ-সমাজের কিছু জীব সেই আগুনকে ঘিরে নাচছে গোল হয়ে, ওই ভাষা সে বোঝে না, বোঝে না ওদের চীৎকার হিংস্র আদিম উল্লাস ধ্বনি, ওকে যেন এইবার সেই আগুনে ঝলসে দেবে ওরা।

চমকে ওঠে গৌরী—মাইকে নাম ঘোষিত হচ্ছে। পরবর্তী শিল্পী হিসাবে ঘোষণা করা হচ্ছে তারই নাম।

···সামনে সারা প্যাণ্ডেল জুড়ে আবছা মুখ-চোখ আর জনতাকে দেখা যায়।

গৌরীর মনে পড়ে বাবার কথা। এই নিঃসঙ্গ স্তব্ধতার মাঝে বাবার সেই সুরটাই মনে পড়ে। গৌরী দেখেছে তার পাথেয় সেই স্মৃতি সেই সুর সেই অনুভূতিই তার সম্বল। সৃষ্টির রাজ্যে নিজেকে প্রকাশ করার সুখ সেইটুকুই। উন্মাদনাময় বিকৃতির রূপকে দেখেছে একটু আগে।

···দর্শকরা স্তব্ধ।

অন্ধকারে মঞ্চের ওপর একটা জোরালো স্পষ্ট লাইটে দেখা যায়, এগিয়ে আসছে প্রকম্প পদক্ষেপে ভীরু নয়না, নম্র শান্ত মেয়ে। দুহাত যুক্তকরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানিয়ে বসল। ঝলমল করছে

একটি আলোক বিন্দুর মত গৌরীর রূপময় অস্তিত্ব। সাদা দুধে-গরদের লালপাড় শাড়িতে তার রূপ যেন আসরে ছড়িয়ে পড়ছে কি স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে। দর্শকরা দেখছে ওকে। কামনার বিকৃতি ছাপিয়ে একটি নম্র নমস্কারের আর্তি নিয়ে সুরটা ওঠে। কলুষ কালিমা মুক্ত করার প্রার্থনার সুর ওই স্তব্ধতার মধ্যে রঙীন প্রজাপতির মত পাখা মেলেছে।

—তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ—

উন্মাদনা-অট্টরোল ভরা আসর ওই সুরের আর্তিতে ভরে ওঠে। গৌরী বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতো এই গানটা। ভোরের বকুল গন্ধ মেশা এর স্মৃতি পাখী ডাকা স্নিগ্ধ সবুজের চিরন্তন মাধুর্য মেশানো। এর সঙ্গে বাবার সেই সুর স্বপ্ন—ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

গৌরী বিস্মিত হয়—যে মানুষগুলো একটু আগে এক উন্মাদনাময় রাজ্যে হারিয়ে গেছল—তারা স্তব্ধ হয়ে অনুভব করছে প্রকৃতি আর মানুষের মহামিলনের এক পুণ্য লগ্নকে।

সেখানে সে চিরন্তন—সেখানেই তার চিত্তের প্রশান্তি। তার সন্ধান সে জানে না।

গৌরীর সুর সেই অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে, কি যাদুমন্ত্রে সে এতবড় আসরে স্তব্ধতা এনেছে। পরপর সে গেয়ে চলেছে মীরার ভজন, সুরদাসের ভজন।

…ক্রমশ গৌরী নিজেকে ফিরে পায়, তার বিশ্বাস এসেছে নিজের ওপর, ছুটতান লয়কারী আর সুরের আবেদনকে প্রাণবন্ত করে তুলে সারা পরিবেশকে বদলে দিয়ে তার অনুষ্ঠান শেষ করে প্রণাম জানায় শ্রোতৃবৃন্দকে।

এতক্ষণ পর হাততালির শব্দে সারা জনতা তাকে অভিনন্দিত

করে। ওরা পেয়েছে একটি চিরন্তন মাধুর্য্যের স্বাদ। তাই ওকে অভিনন্দন জানায় মুক্তকণ্ঠে।

…মাইকে ঘোষিত হচ্ছে পরবর্তী শিল্পীর নাম!

…গৌরী নেমে আসতে কর্মকর্তারা এগিয়ে আসে।

মহীম দাস-এর কৃতিত্বই যেন সব থেকে বেশী। সে বলে—

ক্যামন শিল্পীকে প্রেজেন্ট করেছি দেখছো? হবে না, জাত শিল্পী যে। দেবকণ্ঠবাবুর মেয়ে। যে-সে শিল্পী?

গৌরী কার ডাকে চাইল। ডি. এম. ভদ্রলোক নিজে এসেছেন, সঙ্গে রয়েছেন শহরের নামকরা বৃদ্ধ ডাক্তার কোন জজ সাহেব।

অপূর্ব গাইলে তুমি। এই আসরের পরিবেশ বদলে দিয়েছো মা।

বৃদ্ধ ডাক্তার সেন বলেন—

সত্যিকার গান তো এই। চিত্তকে মাধুর্যে ভরে তোলে। আরও বড় হও মা। চলি মিঃ রায়।

কে যেন বলে—চলে যাবেন এখুনি ডাক্তারবাবু?

বৃদ্ধ বলেন—এরপর তো ওই ব্যাপারই সুরু হবে। সে গান শুনে কাজ নেই—এই রেশটুকু নিয়েই বাড়ি যাই মহীমবাবু।

কলকাতার গাইয়েদের মধ্যেও সাড়া পড়ে যায়। দিলীপবাবু—রীণা ঘোষ ওরা দেখেছে গৌরীকে। আজ গৌরীর মনে হয় এতদিন পর সে বুঝেছে তার পথ কোনদিকে। আজও দেবগ্রামের নিভৃতে যে সম্পদটুকুকে তার বাবা ধরে রেখেছেন—তার ক্ষয় নেই। কালোত্তীর্ণ সেই সুরের জগতেই ফিরে যাবে গৌরী।

বিনোদ আদকও এসেছিল গ্রাম থেকে গানের অনুষ্ঠানে। বিষ্টুপদ সঙ্গে রয়েছে—বিনোদ অবাক হয় গৌরীর ওই গান শুনে।

দর্শকদের মধ্যেও গুঞ্জরণ ওঠে।

কলকাতার গাইয়েদের এত বাদ্যি-বাজনা, লম্ফ-ঝম্প সব তো তালাই গুটোনো করে দিলে হে। অ মামা।

শুধু মামা কেন অনেক শ্রোতাই বলে—

দেবগ্রামের ঘরাণা হে—শ্রেফ তানপুরা—তবলায় আর গলাতে মাৎ করে দিল ; যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

…বিনোদ চুপ করে শুনছে। বিষ্টুপদ বলে—

কেমন শুনলি বিনোদ ?

বিনোদ কি ভাবছে। ওই গৌরীর দাম তার কাছে রাতারাতি অনেক বেড়ে গেছে। আর তাই তার জন্য অনেক বেশী খরচ করতে বাধবে না বিনোদের।

বিনোদ বলল—তবে মানিয়েছিল মাইরী। খাসা !

বিষ্টু চেনে বিনোদের মনের অতলের লোভের কালো ছায়াটাকে। তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। বিষ্টুর কিছু আমদানী হবে।

তাই বিষ্টু বলে—তা সত্যি মেয়েটা দেখতে শুনতেও বাহারের, তাই ডাঁট একটু বেশী। আজ আবার গান গেয়ে মাৎ করেছে। মায় ডি. এম. সাহেব ওকে ডেকে কথা বলেছেন, দাম বাড়বে বৈকি।

বিনোদও দেখেছে সেটা।

বিষ্টু বলে—তা যাক্‌গে বিনোদ, সব ব্যবস্থাই হবে, আমরা তো রয়েছি। আর মহীমদাসও আছে ব্যাটা ভবাকে। দেখছি না, আর সেটা গেল কোথায় ?

—ভবনাথের গান কখন হবে রে ?—বিনোদ শুধোয় বিষ্টুকে।

তখনও ভবনাথের অনুষ্ঠান হয় নি।

ভবনাথ মহীমবাবু ও অন্য কর্মকর্তাদের শুধোয়—আমার প্রোগ্রামটা এবার দিন স্যার ?

ভবনাথের এমনিতেই এখন খারাপ লাগছে। সব খ্যাতি প্রশংসা

যেন গৌরী কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। আর কর্মকর্তারাও তেমনি। গৌরীর কথায় তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গান শেষ হবার পর গৌরী বলে—

আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। বাবা ভাববেন বেশী রাত হলে।

গৌরীর কথায় ওরা শশব্যস্ত হয়ে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়—একজন ভল্যানটিয়ারকেও তুলে দিল গাড়িতে। সে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ভবনাথ দেখেছে, গৌরীকে ওরা আরও টাকা দিয়েছে। সেই সঙ্গে কে কি কি সব উপহারও দিয়েছে, মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি, হাতির দাঁতের কি স্মারকচিহ্ন—সে সব গাড়িতে তুলে ওরা গৌরীকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল।

কিন্তু ভবনাথকে যেন ওরা কেউ চেনে না!

ভবনাথ মহীমদাসকে একবার দেখতে পেয়ে কথাটা জানাতে মহীম বলে—ওদের দেখছি।

তারপর আর মহীমকেও দেখতে পায় নি ভবনাথ।

অনুষ্ঠান পরিচালককে ধরেছে ভবনাথ—আমার প্রোগ্রামটা দিন স্যার! ভবনাথ গাঙ্গুলী—

সে ভদ্রলোক অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে—আপনার প্রোগ্রাম!

লিস্টটা বের করে বলে—আপনার নাম তো নেই। তাছাড়া এখনও অনেক নামী শিল্পীর প্রোগ্রাম বাকি। মশাই লোকে টিকিট কেটে এসেছে তাদের গান শুনতে। যাকে তাকে বসিয়ে দিলে অডিয়ান্স মাথায় চেয়ার ভাঙবে মশায়। দেখলেন তো গৌরী দেবীর অনুষ্ঠান। ওই স্ট্যাণ্ডার্ড-এর শিল্পীর পর আপনাদের গাইতে দিই কি করে? পরে দেখছি—এখন বসুন তো মশায়।

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে সরে গেল। ভবনাথ নীরব রাগে ফুলছে। গজগজ করে সে—ডেকে এনে ইনসাল্ট করবেন? কোথায় মহীমবাবু?

ভবনাথ এবার বুঝতে পেরেছে বাইরের জগতে তার কোন নাম ধামই নেই, আর ওই দেবকণ্ঠবাবুর মেয়ে এক নিমেষে আসরে বসে দেখিয়ে গেল তাদের নাম দাম আর যোগ্যতা। তার তুলনায় ভবনাথ আজ তুচ্ছ! ওরা তার কথা ভাবে না।

ভবনাথ-এর অনুষ্ঠানের কথাও ভুলে গেছে সবাই।

ভবনাথ নিষ্ফল রাগে গর্জাচ্ছে।

কি ভেবে প্যাণ্ডেলের বাইরে রাত্রির অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। ওদিকে প্যাণ্ডেলের আলো জ্বলছে লোকজনের ভিড়। অন্ধকারে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভবনাথ মনের জ্বালাটাকে ভোলবার জন্য ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে। ওটা তার সঙ্গেই থাকে। মহিমবাবুর খোঁজ করতে বাইরে এসে ভবনাথ তেষ্টা বোধ করে গলায় ঢালতে থাকে তাজা মদ।

বিনোদ তখনও বলে ভিতরে বসে—ভবার গান দেখবি কি দারুণ হবে ও আমাদের মুখ রাখবে।

বিষ্টু বলে—নিশ্চয়। দুদিনের ছুঁড়িটা যদি আসর মাত করতে পারে—আমাদের ওস্তাদ আসর কাঁপিয়ে দেবে। দেখা যাক—

বিনোদের রাগটা ফেটে পড়ে ভবনাথের অনুষ্ঠান না হতে দেখে। অবশ্য বিষ্টুই খবরটা আনে ভিতর থেকে।

ভবনাথ-এর তখন তুরীয় অবস্থা। মদ গিলে ভবনাথ একটা বেঞ্চে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে ঠেলে উঠে গর্জাচ্ছে।

—আমি শ্লা গাইয়ে নই। আসুক কোন্ ব্যাটা আমার সাপর্ট তানের জবাব দেবে? আর ওই নেচে নেচে গান আম্মাও পারি।

মাতাল লোকটা টলতে টলতে উঠে জড়ান গলায় গান ধরে—

কদম তলাতে বাজে বাঁশী—

লোকজন বিনে পয়সার এমন নাচ গান দেখতে ভিড় করেছে।

ভোর হয়ে আসছে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। তখনও ভবনাথের পাত্তা নেই। প্যাণ্ডেলের বাইরে কোথায় রয়েছে সে।

বিনোদ বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দর্শকরা চলে যাচ্ছে।

আজকের অনুষ্ঠানের সেরা প্রোগ্রাম করেছে গৌরী। মহীম কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে অনুষ্ঠান নিয়ে।

জেলাবার্তার সম্পাদক ফটোগ্রাফাররাও রয়েছে। তাই নিয়ে আলোচনা চলছে, হঠাৎ বিনোদকে দেখে চাইল মহীম। মহীম দাস জানে একটা কাজের মত কাজ করেছে সে।

আজ গৌরীকে অনুষ্ঠানে গাইয়ে নিজেকেও ধন্য মনে করে সে। গৌরীর সব খ্যাতির অংশীদার যেন সেও।

উদ্যোক্তারা বলে—দারুণ আর্টিষ্ট ও মহিম দা।

কাগজওয়ালারাও খবর নেয় গৌরার সম্বন্ধে তার কাছে।

ডি এম সাহেব চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেরা ওকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গৌরীর একক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতেও বলেছেন তাঁরা আবার এই সহরে।

মহীম দাস জানে গোকুলপুরের ব্রিজের বড় কনট্রাক্ট এবার সে পাবে। এমন সময় বিনোদকে দেখে চাইল মহীম দাস। মহীম এগিয়ে এসে শুধোয়।

—কেমন গান শুনলে বলো বিনোদ? গৌরী কেমন আর্টিষ্ট? দেবগ্রামের নাম তো এখন এখানের লোকের মুখে মুখে হে।

বিনোদ বেশ খুশী হয়নি। তার পেয়ারের শিল্পীর অনুষ্ঠান হয়নি। তাই শুধোয় বিনোদ—

ভবনাথের গান হল না তাকে চান্স দিলেন না এরা।

অবাক হয় মহীম—তাকে তো দেখলাম না। ওরাও খুঁজছিল প্রোগ্রামের জন্য। কোথায় যে গেল তখন?

…ভবনাথ ঢুকছে। সৌখীন জামা কাপড়ে ধুলো ময়লা পানের পিচের দাগ, ধুতিটা খুলে গিয়ে লুটোচ্ছে। ভবনাথ মহীমকে দেখে গর্জে ওঠে জড়িতস্বরে।

—এ্যাই যে মহীম! শ্লা—আমি কি কমতি? আমার তালের জবাব দেবে সে এখনও মায়ের গব্বে। আমাকে কিনা প্রোগ্রাম দেবে না—শ্লা গেয়ে গেল ওই কালকের ছুঁড়ি। আমরা কি মরে গেছি নাকি! এ্যা—

বিনোদ গুম হয়ে গেছে।

এখম তারই অপমান।

বিষ্টু কোনমতে ভবনাথকে গাড়িতে তুলেছে। ওরা ফিরছে গ্রামের দিকে। নেশার ঘোরে একদিকে অসাড় হয়ে পড়ে আছে ভবনাথ। বিনোদ বলে—এসব ওই মহীম আর ওই ছুঁড়িটারই পলিটিকস্।

বিষ্টু জানে হুজুরের মন রাখার কৌশলটা। বিষ্টুপদ বলে—

—ঠিক বলেছো মাইরী। ওই ছুঁড়িটাকে মহীমের নজর ধরেছে, তাই ভবনাথ ওস্তাদকে মদ গিলিয়ে আউট করে দিয়ে মহীম ওই মেয়েটাকেই গান গাইতে দিয়েছিল। জানে ভবনাথ গান গাইলে মেয়েটার দফা শেষ হয়ে যাবে তাই তাকে এমনি করে পলিটিকস্ করে আউট করে দিল।

বিনোদ আদক চাপাস্বরে গর্জায়।

—ওই মহীম দাসকে দেখে নোব—আর ওই মেয়েটাকেও। ওর ডাঁট আমি ভেঙে দোব এবার।

বিষ্টুপদ একটু উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে মনে মনে খুশী হয়। কারণ বিনোদের এইসব কাজগুলো সেইই করায় আর তার আমদানীও হয়।

বিনোদকেও বেশী করে মোচড় দেওয়া যায়। তাই বিষ্টুপদও এসব সুযোগ ছাড়তে চায় না। কাজ করার গন্ধ পেয়ে এবার ইন্ধন যোগায়—

—এ আর এমন কি কাজ ছোটবাবু, হুকুম করলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর খরচ খরচার ব্যাপারে আপনার কোন দিনই আটকাবে না।

বিনোদ আদক কি ভাবছে। মনে হয় একটা ব্যবস্থাই নেবে এবার।

রাত্রি নেমেছে নির্জন প্রান্তরে। পিচের কালো ফিতের মত রাস্তাটা হেডলাইটে দেখা যায় পড়ে আছে মৃত সরীসৃপের মত, গাড়িটা গৌরীকে নিয়ে ফিরছে গ্রামের দিকে।

যে মন নিয়ে গৌরী গিয়েছিল, ফিরছে সে সেই মন নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ অন্যমন নিয়ে। আজ সে এক নোতুন জগৎকে দেখেছে যা কল্পনাই করেছিল এতদিন!

বাবার কথা মনে পড়ে।

বাবার মুখ সে রেখেছে। দেবকণ্ঠবাবুর মেয়ে তারই ঘরানার গান গেয়ে আজ এতবড় অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাবার সাধনা বৃথা হয় নি!

রাত্রি হয়ে গেছে। তারাগুলো জ্বলছে আকাশে।

নিশুতি বাড়িটার সামনে এসে নামল তখন অনেক রাত্রি।

ওদের ঝি মানদা আর মাহিন্দরটা জেগে ছিল। গাড়ির শব্দে বের হয়ে আসে তারা। দরজা খুলে দেয়। মানদা বলে।

—ফিরেছো দিদি?

গৌরী জিনিষপত্রগুলো নিয়ে নামছে। মানদাও অবাক হয়।

—এসব কি গা?

গৌরী বলে—গান শুনে খুশি হয়ে ওরা পুরস্কার দিলেন রে।

মানদা বলে ওঠে—ওমা! তাই নাকি! চল, ভিতরে চলো!

গৌরীর মনে পড়ে বাবার কথা।

শুধোয় সে—বাবা ঘুমিয়েছেন?

মানদা বলে—হ্যাঁ! খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের বলল, তোরা জেগে থাক, তুমি ফিরবে।

গৌরী বাবাকে আর এসময় ঘুম থেকে তুলতে চায় না।

রাত্রি অনেক হয়েছে।

মানদা বলে, তুমি খাবে তো? খাবার রেখেছি কিন্তু।

গৌরী বলে—না। অনেক খাইয়েছেন ওরা। আর খাব না কিছু। দরজা বন্ধ করে তোমরা শুয়ে পড়ো মানদা দিদি।

গৌরীর ঘুম আসে না।

সারা দেহমনে কি নিবিড় উত্তেজনা জাগে। সেই প্যাণ্ডেল ভর্তি জনতার ছবিটা ভেসে ওঠে। ভয়ে ঘাবড়ে গেছল গৌরী, কিন্তু বাবার আশীর্বাদ যেন তাকে ঘিরেছিল বর্মের মত। বাবার সেই প্রিয় গান-গুলোই গেয়েছিল সে।

গেয়েছিল—যোগী মৎ যা—

ভৈরবীর করুণ মূর্চ্ছনা যেন এই মধ্যরাত্রির তারাকিনী আকাশের নীচে এই ধরণীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

গৌরীর দুচোখ বুজে আসছে ঘুমে। কোথায় রাত-জাগা পাখী একবার ডেকে ডেকে থেমে গেল। রাতের হিমেল বাতাসে দুচোখের পাতা বুজে আসে ক্লান্ত মেয়েটির।

গৌরী যেন সুরের কোন রাজ্যে হারিয়ে গেছে—পাখী ডাকা আলো ভরা একটি জগৎ সীমাহীন সমুদ্রের ঢেউ এসে ভাঙছে, বালুচরে ঝাউবনে ওঠে বাতাসের সুর। আলো ভরা আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে গৌরীর সুর—সেই জগতে চলেছে গৌরী একা।

সামনে প্রথম দিনের উজ্জ্বল রক্তাভ অরুণোদয়। রূপালি বালিয়াড়িতে রক্তাভা নিয়ে প্রথম আলোর আবির খেলা সুরু হয়েছে। সুরটা এই জগতে এনেছে প্রাণের স্পন্দন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় গৌরীর। জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। শিউলিগাছে এসেছে সাদা ফুলের হাসি। সুরটা শুনে অবাক হয়। বাবার গলা মিশেছে মাঝে মাঝে—তরুণ সতেজ একটি গলার সুরমাধুরী আর ভাব নিয়ে সুরের প্রতিটি পর্দা সব শ্রুতি যেন বর্ণময় হয়ে উঠেছে। এমন অপূর্ব বড় একটা শোনে নি সে। গৌরী কাল রাতে বুঝেছে জীবনের একটা কঠিন সত্যকে। বাবাকে চিনেছে নোতুন করে। তার সাধনা ব্যর্থ হয়নি।

কাল তাঁরই আশীর্বাদে যেন গৌরী নোতুন রাজ্য জয় করে এসেছে। সামনে জমা করা ওই উপহারগুলো নমস্কারীর কয়েকশ' টাকা—কতলোক তাকে আরও কিছু টাকা বেশী দিয়েছে। এ যেন গৌরীর নয়—বাবার সাধনার স্বীকৃতি। তা অর্জন করে এনেছে গৌরী।

গৌরী উঠে এগিয়ে যায় অবাক হয়ে, ওই সুরের সন্ধানে।

—তুই!

দেবকণ্ঠ গৌরীকে দেখে বলল!

ললিত তন্ময় হয়ে আলাপ করছিল। সে-ও দরজার কাছে ওই মেয়েটিকে দেখে তানপুরার সুরটা বন্ধ করে চেয়ে থাকে।

সুরের একটি মৃদু রেশের মতই যেন গৌরীর উপস্থিত ওই জায়গাটাকে ভরিয়ে রেখেছে। মুখে চোখে ঘুমের জড়তা মাখানো গৌরীর দুচোখের চাহনিতে ফুটে উঠেছে নীরব বিস্ময়। ও দেখছে ললিতকে।

সুন্দর চেহারা। চোখ দুটোর নিষ্পাপ চাহনিতে ফুটে উঠেছে

সৃষ্টির তন্ময়তা। ভোরের উদাস সুরের ছায়া ওর চোখে মুখে।

ললিতও দেখছে গৌরীকে। সকালের শিশির ভেজা পাপড়ির স্নিগ্ধতা নিয়ে ও এসেছে। দেবকণ্ঠের কথায় গৌরী চাইল।

—কেমন গাইলি কাল? আধুনিক গানটানের খবর তো জানি না ঠিক। আর যন্ত্রটন্ত্রও ওদের দেশী বিলেতী নানা রকমের। সুর তাল ছাড়াও হার্মনাইজেশন-ফেশন কি সব করে ওরা। তুই কি গাইলি?

গৌরী কাল রাতে শুনেছিল প্রথম আসরে ওমনি সব সুর। রিদম টোম্পা নানা কিছু দিয়ে বাজনা দিয়ে নানা অলঙ্করণ করা সেই গানের নামে কোলাহলও শুনেছিল সে।

তার কাছে মনে হয়েছিল ওতে চমক থাকতে পারে, সুরের বিন্যাস নেই। ঝড় থাকতে পারে—তৃপ্তি নেই, কলরব আছে, ব্যাকুলতা নেই। সবটাই যেন কৃত্রিম মেকী, আর ময়ুর পাখীর পাখনা লাগানো দাঁড়কাকের মতই। পেখমধারী মাত্র।

গৌরী বলে—ওসব গাই নি বাবা। আমি তোমার শেখানো গানই গেয়েছি। তাতেই আসর স্তব্ধ হয়ে গেল।

চমকে ওঠে দেবকণ্ঠ, সে জানে তার গানের ঘরাণার আজ কোন দাম নেই। তার দিন ফুরিয়ে গেছে। আর সেইসব বন্দেজী গান—ভজনাঙ্গ গান গেয়ে যে আদৌ অমনি আসরে কোন নামই করতে পারবে না, বরং হাততালি চীৎকার করে তাকে তুলে দেবে।

আজ গৌরীও সেই অপমান সয়ে এসেছে হয়তো।

দেবকণ্ঠবাবু ভাবেনি গৌরীও এমনি অপমান সহ্য করুক জীবনের প্রথম অনুষ্ঠানেই। মনে হয় ভুলই করেছে দেবকণ্ঠ। মেয়েকে ওই উচ্চাঙ্গ গান-এর পথে নিয়ে গেছে। সেখানে আছে অবজ্ঞা আর অনাদর। দেবকণ্ঠ বলে ওঠে।

—একি করে এলি গৌরী? একটা চান্স পেলি বাইরে নাম

করার সেটাকেও নিতে পারলি না? তাহলে গেলি কেন? ওরা কেউ এসব গান শুনতে চায় না। শুনবে না।

আমি ললিতকেও বলি, এ ভুল কেন করছো? নিজের খ্যাতির জগৎ ছেড়ে কেন এ কষ্টের পথে আসছো? এখানে নাম খ্যাতি হাততালি পয়সা কিছুই নেই। আছে শুধু অভাব দুঃখ আর অবজ্ঞা। তোমার আপনজনই তোমাকে অবজ্ঞা করবে।—তুই নিজের সর্বনাশ করে এলি?

গৌরী চমকে ওঠে। ললিতও দেখছে দেবকণ্ঠকে। ও যেন জীবনে আজ পরাজিত অবজ্ঞাত।

গৌরী বলে ওঠে—

এ তোমার ভুল বাবা। আর এটা যে কত বড় ভুল তা কালকের আসরেই দেখে এসেছি। কাল ওইসব গানের মধ্যেই আমি অনুষ্ঠান করেছি। ভজনাঙ্গ রাগপ্রধান তোমার শেখানো গান দিয়ে, ভালো করে সুরটাকে ছুঁতে চেয়েছি, তোমার আশীর্বাদে কাল আমার অনুষ্ঠানই সবচেয়ে ভালো হয়েছে বাবা। হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছে সেই গান—একটার পর একটা গান গেয়েছি। সুরদাস মীরার ভজন থেকে রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ অবধি।

দেবকণ্ঠ অবাক হয়। ওর বিষাদভরা মুখখানায় নোতুন কি আশ্বাস, আশার আভা জাগে।

দেবকণ্ঠ বলে—কে জানে মা?

ললিত বলে ওঠে—এ সত্যি মনে হয়, মানুষের বাইরের রূপ বদল হলেও তার মনের এক জায়গায় সেই অনুভূতিটা থেকে যায়, যখনই সত্যিকার কিছু সে পায় তাকে মেনে নেবেই।

দেবকণ্ঠবাবু বলে—তুই ওকে চিনিস না গৌরী! ও ললিত, কলকাতার ছেলে, ভালো গাইতো। যাত্রার আসরের নাম করা গাইয়ে, সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে—

গৌরী ওর দিকে চাইল। দু'হাত তুলে নমস্কারও জানায় গৌরী। মনে পড়ে যাত্রার আসরের গান। সেদিনও একনজর দেখেছিল তাকে এই বাড়ির এদিকে। তন্ময় হয়ে ললিত তার রেওয়াজ শুনছিল।

আজ মনে হয় গৌরীর, ছেলেটির সাধনায় নিষ্ঠা আছে। নাহলে যাত্রায় ওই প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে এখানে পড়ে থাকতো না।

দেবকণ্ঠ আজ গৌরীকে আবার রেওয়াজ করতে দেখে খুশী হয়। আজ মনে হয় দেবকণ্ঠ ঠকে নি।

তার নিজের গায়কীতে হয়তো কোথায় গলদ ছিল, যার জন্য গায়ক হিসেবে তার নাম তত হয় নি, কিন্তু তার মেয়ে গৌরী—ওই ললিত-এর সুন্দর গলা, তাদের সুর তার এতদিনের সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখবে, গৌরবময় করে তুলবে।

কটা মাস কেটে গেছে। দিনগুলো সহজভাবেই কেটে যায়, ললিতের বাবা কালিদাসবাবু ব্যবসাপত্র নিয়ে ব্যস্ত। বড় ছেলের সময় নেই। নোতুন কারখানা চালু করেছে। ওরা তার প্রডাকশন মার্কেটিং নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, সময় নেই। পয়সার নেশায় তারা যেন সব ভুলে গেছে। শুধু টাকার বর্ধিত অঙ্কটাই তাদের কাছে একমাত্র সান্ত্বনা আর লক্ষ্য।

বৃদ্ধ কালিদাসবাবু আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সারা জীবন শুধু খেটেছে আর অর্থের পিছনে দৌড়েছে পরমার্থ জ্ঞানে। আজ মনে হয় একদিকে তাই শূন্যতার বোঝাই বেড়েছে।

স্ত্রী গত হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। দেখার সময়ও পায় নি। তখন কারখানার কাযে বোম্বাই-এ পড়েছিলেন। ছোট ছেলে ললিত তখন সবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই ললিত এই পরিবারের থেকে স্বতন্ত্র।

কালিদাসবাবু সেদিন ওকে চিনতে পারে নি। অর্থে ওর লোভ নেই টাকা রোজকারের মোহও নেই।

কালিদাসবাবু ওকে বলে—কারখানায় বের হ এবার।

হাসে ললিত। ওসব আমার পোষাবে না।

টাকাকড়ি তো রোজকার করতে হবে?—বড় ভাইও মন্তব্য করে।

ললিত বলে—তোমরা তো অনেক টাকা রোজকার করেছো, কি হ'ল তাতে?

সেদিন কালিদাসবাবু ললিতের কথাটার মানে ঠিক বোঝে নি। তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে ললিত ঠিকই বলেছিল। অর্থ সম্পদেরও একটা সীমা আছে তারপর সে টাকার দাম থাকে না। আর জীবনভোর রোজকার করে কালিদাসবাবুর মনে হয় শূন্যতা বেড়েছে মাত্র।

ললিত হয়তো এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছে যা তাকে এই টাকার মোহ তুচ্ছ করতে শিখিয়েছে। সে গান বাজনা নিয়েই মেতে থাকতো। তাই নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি সুরু হয়। কালিদাসবাবুও টের পান, বৌমায়েরও দুচারটে কথা শুনেছে ললিত, যেগুলো তার কাছেও ভালো লাগেনি। কালিদাসবাবু তাই বলেন ললিতকে।

—কাজকর্ম দেখা শোনা কর। বৌমাও বলে। কিছু করবি তো!

হেসেছিল ললিত—কারো বোঝা হয়ে থাকবো না বাবা। আমার এখানে কোন দাবীও জানাবো না।

ললিত তারপরই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছল। কালিদাসবাবু সেদিন চুপ করে শোনে খবরটা। বড় বৌমা—বলে যাত্রার দলেই গেল শেষকালে ঠাকুরপো!

কালিদাসবাবু জানান।

—এবাড়ির দেওয়া নামটাও নেয় নি বৌমা, তোমাদের সব

পরিচয় সে মুছে ফেলে চলে গেছে। তোমাদের বোঝা হয়ে তবু থাকে নি সে।

যাত্রার দলের পালা শেষ হতো বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, তখন মাস তিনেক যাত্রার দলের ছুটি।

নোতুন পালার রিহার্সেল হবে, এখন তোড়জোড় চলছে। সেই ক'মাস তবু ললিত কলকাতায় বাড়িতে থাকতো। কালিদাসবাবু দেখেছে এ যেন অন্য কোন মানুষ। নিজের রেওয়াজ নিয়ে বড়বাড়ির এক তলার কোণে কোথায় থাকতো কোন অপরিচিত অতিথির মত।

গাড়ি রয়েছে দু' তিনখানা। কালিদাসবাবু বলতো—

—একখানা গাড়িতেই যাতায়াত করতে পারিস! বাসে ট্রামে যা ভিড়।

ললিত হাসতো মাত্র। জবাব দিত—ওই ভালো।

ইচ্ছে করেই সব বিলাস ব্যসন, এ বাড়ির প্রাচুর্য্যকে সে এড়িয়ে যেতো, যেন এখানের কেউ নয়।

তারপর হারিয়ে গেছে ললিত এ বাড়ি থেকে।

কালিদাসবাবু ললিতের বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটা নিয়ে ভাবনাতেই পড়েছিলেন। ভাবতে পারেননি যে ললিত দাদা-বৌদির ওই ব্যাপার নিয়ে এ বাড়ি থেকেই চলে যাবে! ছেলেটা এমনিই।

সংসারের কোন কিছুতেই তার আকর্ষণ নেই। আর সে যেন সব কিছু থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে রেখেছিল, আজ সরে গেল। দাশরথি বলে—

দরকার কি ওর জন্য ভেবে। যে আপনার কথা ভাবলো না, তার জন্য ভেবে লাভ কি?

চুপ করে থাকেন কালিদাসবাবু। ভয় হয়। তাই শুধোন—সে না থাকুক বাড়িতে, কোথায় গেল সেটা তো জানা দরকার।

দাশরথি গজগজ করে—কচি খোকা নয় যে হারিয়ে যাবে। গেছে বোধহয় কোন বন্ধুর বাড়িতেই। দু'চারদিন থাকবে, রাগ পড়লেই আবার ফিরে আসবে। যাবে কোথায়?

কালিদাসবাবু ভাবছেন কথাটা। হয়তো সত্যিই। তবু ফিরে আসুক ললিত, তাকে নিয়ে এবাড়ি থেকে চলে যাবেন দক্ষিণের বাড়িতে। এখানে বসন্ত-বৌমা থাকুক তাদের সব কিছু নিয়ে।

ক'টা মাস কেটে গেছে।

সেদিন কালিদাসবাবু সকালে বারান্দায় বসে আছেন, দাশরথি চায়ের খালি কাপ ডিস তুলছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বসন্ত আর পিছু পিছু নিরুপমাকে বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ঢুকতে দেখে চাইলেন। ইদানীং ওরা এই মহলে বিশেষ আসে না।

আজ এসেছে। বসন্ত হাতের খবরের কাগজটা মেলে ধরে বলে বেশ চড়া স্বরে।

—দেখুন আপনার গুণধর ছেলের কীর্তি!

নিরুপমাও চটেছিল। সেও যোগান দেয়।

—শেষকালে কিনা গিয়ে জুটলো ওই যাত্রার দলে? ছিঃ-ছিঃ!

কালিদাসবাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে শুধোন—কি বলছো তোমরা? কি হ'ল?

বসন্ত বলে—আর বাকী রইল কি? ওই হতচ্ছাড়া কিনা গিয়ে জুটলো ওই যাত্রার দলে? যাত্রার দলে রং মেখে সং সাজতে গেল এই বাড়ির ছেলে?

নিরুপমা আর একটু চড়াস্বরে বলে—কোন্ খ্যামটাওয়ালীর পাল্লাতে পড়েছে ছাখোগে। ছিঃ!

দাশরথিও দেখছে ছবিটা। বলে সে—হ্যাঁ। ললিতই! তবে বাবু নামটা যেন অন্য কি?

বসন্ত বলে—যাত্রার দলের নাম নিয়েছে। কোন ছাতার কুমার!

ইতর। এবাড়িতে আর ঢুকতে দেব না তাকে।

কালিদাসবাবু দেখছেন ছবিটা, ললিতই। কোন যাত্রাদলের এখন নামকরা গাইয়ে এ্যাক্টর। কালিদাসবাবু ছেলের কথায় বলেন—

এত রাগ করছো কেন? যাত্রার দলে এখন অনেক ভালো ঘরের ছেলেরাই তো রয়েছে। তারাও শিল্পী। তাদের নামে এসব কথা বলা ঠিক নয়।

নিরুপমা গর্জে ওঠে—তা বলবেন বৈকি বাবা!

বসন্ত বলে—আমরা সব বেঠিকই বলি; আর যা করে ললিত সেটাই ঠিক। তবে এও বলে রাখছি এ বাড়িতে সে যেন না আসে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর রাখতে চাই না আমরা।

নিরুপমা জানায়—আমার বাপের বাড়িতে এ নিয়ে অনেক কথাই উঠেছে। ছিঃ ছিঃ!

কালিদাসবাবু এতদিন তবু এদের অনেক নোংরামি সয়ে এখানে ছিলেন, আজ তার কাছে এদের মনের কালো ছবিটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। বলেন তিনি—এ বাড়িতে আমিও থাকছি না বৌমা। আর ললিত যদি ফিরে আসে সেও আসবে না। দাশরথি, কালই লেক গার্ডেনস-এর বাড়িতে আমরা চলে যাবো।

বসন্ত মনে মনে খুশী হয়।

খুশী হয় নিরুপমাও। তবু সে বলে—এভাবে কথাটা বলিনি বাবা। কেন এসব ভাবছেন!

হাসেন কালিদাসবাবু, বিষণ্ণ মলিন হাসি। তাকান তিনি। —তোমরা ললিতকে নিয়ে অনেক ভাবনায় পড়েছো মা, তাই ব্যাপারটার মীমাংসা আমিই করে দিলাম।

কালিদাসবাবু তবু ললিতকে খুঁজতে আসেন যাত্রাপাড়াতেই। দাশরথিও সঙ্গে রয়েছে। বিডন স্ট্রীটের ওদিকে বাড়িটা খুঁজে পেতে

দেরী হয় না। বহুকালের পুরোণো ছাতাপড়া বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে দেখছেন এদিক ওদিক।

দেওয়ালে এখানে ওখানে অনেক যাত্রাদলের লিষ্টে সাইনবোর্ডের ফাঁকে সেই দলের নামও রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে ঢুকে অবাক হন।

খুপরি ঘরে এক একটা দল। সিটকে মত একটা লোক ধরেছে ওদের।

বলে সে—বিপিন অপেরা কি গাইবে? তার চেয়ে নন্দরাণী অপেরার এবার সতী এলো ঘরে। নিউ কাঙ্গাল অপেরার ধর তক্তা মার পেরেক, নৃসিংহ অপেরার সিঁন্দুর পরিয়ে দিই, আর কাল্পনিক নাটক চান—পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে যান, দেখবেন আসর জমে যাবে।

গলা নামিয়ে বলে সে—কম-সম করে দেব দু'পালা। আসুন।

দাশরথি বলে—পালা গান-এর বায়না করতে আসিনি মশাই। খুঁজছি একজনকে।

—তাই নাকি। নায়েকপক্ষ নন? ধ্যুস্! আগে বলতে হয়। লোকটা এভাবে আওয়াজ দিল তাতে মনে হয় ওদের নায়েকপক্ষ ছাড়া ভুভারতে মান্যগণ্য আর কেউ নেই। আর সব বাজে।

অন্য একজনকে বিপিন অপেরার খবর শুধোতে সে বলে—তিন তলায় চলে যান।

যাত্রার দলের ঠিকানা ওই গদিঘরে থাকে, কিন্তু দল-এর পাত্তা থাকে না। গদিঘরের একজন বলে।

—দল তো এখন বাইরে। আজ—ঝালদা। কাল—মালদা। পরশু—এঁড়েদা। ওসব খবর পাওয়া মুস্কিল। তবে চিঠি রেখে যান কেউ দলকে ধরতে গেলে চিঠি পৌঁছে যাবে।

কালিদাসবাবু ভেবেছিলেন ললিতের দেখা পাবেন, কিন্তু হতাশ হন।

লোকটি বলে—দেখা করতে হয় জ্যোষ্ঠি মাসে আসবেন। ষষ্ঠী

থেকে জ্যোষ্ঠি মাস অবধি না গাইলে দলকে লাটে তুলতে হবে স্যার নমস্কার।

কালিদাসবাবু হতাশ হয়ে বের হয়ে এলেন।

দাশরথি বলে—চিঠিই এককান দিয়ে ছ্যান, যদি পৌঁছতে পারে।

কালিদাসবাবু বলেন—তাই ভালো। আজ লিখে রাখছি। কাল দিয়ে যাবি। গদিঘর তো চিনে গেলি এদের।

ওরা ফিরছে গাড়িতে। কালিদাসবাবুর মনে হয় ললিত কি অভিমান নিয়েই আজ তাদের ছেড়ে চলে গেছে ওই যাযাবর জীবনে. আর ওই ঘোরার জীবনের সব কষ্টকেও সহ্য করে চলেছে সে।

এভাবে বাঁচা যায় না।

তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু ভাবনায় পড়েছেন কালিদাসবাবু, ছেলেটা যেন হারিয়ে গেল এখান থেকে কি বেদনা নিয়ে। বসন্ত-নিরুপমার মনে এ বেদনার কোন রেখাপাত করেনি। একা এই যন্ত্রণাটা বইছেন তিনিই।

দাশরথি বলে—চিঠি পেলে ঠিক আসবে ললিত।

কালিদাসবাবু চাইলেন ওর দিকে।

...খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহীম দাস ক'দিন পরই এসেছে গ্রামে। সঙ্গে এসেছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজে। তরুণ ভদ্রলোক সারা জেলায় গ্রাম—মাঠ—মেলায় ঘোরেন, নিজেই দামী ক্যামেরায় ছবি তোলেন, তাবত ভাঙা মন্দির—মসজিদ-এর ছবি। যাত্রা লেটো—আলকাপ গান-এর আসরে, মেলার বাউলদের গানের আখড়ায় গিয়ে বসেন খাতা পেন্সিল—টেপ রেকর্ডার নিয়ে। ওদের গান রেকর্ড করেন ছবি তোলেন। এই সব নিয়ে কলকাতার কাগজে নানা লেখা ছাপা হয় তার। আর শিল্পীদের সমন্ধে আস্বাদও আছে তার।

সুবিনয়বাবু জেলার পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও এখানের লোক

সংস্কৃতি অতীতের ঐতিহ্য ইতিহাস নিয়েও গবেষণা করেন। দেবগ্রামের মত পুরোনো জায়গায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই ঘরাণা নিয়েই খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন তিনি।

সঙ্গে এসেছে মহীম দাসও। ডি-এম সাহেব ওকেই সঙ্গে এনেছেন! কারণ এ অঞ্চলের শিল্পী ওই দেবকণ্ঠবাবুকে সে চেনে।

দেবগ্রামের শান্ত জীবনে ডি-এম সাহেবের আগমনের কারণটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিনোদ আদকও শুনেছে কথাটা। হারাণবাবু নিজে গদি থেকে এসে খবরটা জানায়।

—ওরে বিনু, একবার দেখা করে আয়। ভেটপত্তর কিছু পাঠাচ্ছি। আমিও যাবো। আর শুনলাম সাহেব নাকি গান-টান ভালোবাসে, তাই এসেছেন। একটু আলাপ করে আয়। মানে তুইতো এসব নিয়ে থাকিস! ওই সব করে মহীম তো সাহেবের খুব কাছাকাছি এসে গেছে, দ্যাখ না যদি একটু ভিড়তে পারিস! কাজ কর্মের সুরাহা হবে!

বিনোদও তা জানে।

আর বিনোদ ভবনাথকে আশ্রয় দেয় ভেবে হারাণ আদক ভেবেছে তার ছেলে বিনোদও গান বাজনার সত্যিকার সমঝদার।

বিনোদ বাবার কথায় বলে।

—আমি দেখছি বাবা! একবার যাবো বৈকি!

হারাণ বলে—তাই যা। সাহেব ডাকবাংলোয় উঠেছেন।

বিনোদ ভাবছে কথাটা।

সেই রাতে সদরে নিয়ে গিয়ে ভবনাথকে অনুষ্ঠান করতে না দিয়ে ওরা ভবনাথকেই অপমান করেনি—সেই অপমান বেজেছে বিনোদের বুকেই।

ওই গৌরীকে গাইতে দিয়েছিল ইচ্ছে করেই। মহীম দাস এসব

করেছে মহানন্দ বাবু আর দেবকণ্ঠের কথামত। এবার বিনোদ এ:
জবাব দেবেই।

আর বিনোদ জানে মহীম দাস এই করে কায গুছিয়ে নিয়েছে এবার বিনোদও এই অঞ্চলের একজন নোতুন শিল্পীকে পরিচিত করাবে ডি-এম সাহেবের সামনে। জানিয়ে দেবে মহিম দাস-এর চেয়ে বিনোদও কমতি নয়।

বিষ্টুপদও এসে জুটেছে বানের আগে ভেসে আসা খড় কুটোর মত। বিনোদ ওকে দেখে বলে।

—একবার ভবাদাকে ধরে আন বিষ্টু এখুনি!

বিষ্টু বলে ওঠে—কথাটা আমি শুনেই এসেছি বিনু, এবার নাকি ডি-এম এখানের শিল্পীদের গান শুনবেন, রেকর্ড করতে চান। মহিমকে দেখলাম হন্ত-দন্ত হয়ে দৌড়চ্ছে ভটচার্য পাড়ার দিকে। বোধ হয় গৌরীর খোঁজেই।

বিনোদ বলে—এবার ভবনাথকেই গাওয়াবো। ডেকে আন ওকে। যেন এবার গড়বড় না করে সে! বেশ জামাকাপড় বদলে ধোপদুরস্ত হয়ে আসতে বলবি!

বিষ্টুও দৌড়ালো পোষা কুকুরের মত। এবার একটা খেলই দেখাবে তারা।

বিনোদ ভাবছে কথাটা। গৌরীকে এবার আর সেই খ্যাতি পেতে দেবেনা কিছুতেই।

মহীম দাস ডি-এম সাহেবকে ডাকবাংলোয় রেখে নিজের কাজে বের হয়েছে। দেবকণ্ঠ বাবুকে যেভাবে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে আনতে হবে, আর গৌরীও সঙ্গে থাকবে। জমিয়ে ওদের গান শোনাতে পারলে তারও কায হবে।

মহীম দাসও বুঝেছে বিনোদ আদকের দল তাকে অনুরোধ কি করেনি। তার উপর রেগেই আছে ওরা। ভবনাথ যে সেদিন

ফ্যাংশানের দিন মদ গিলে ওই জঘন্য কাণ্ড বাধাবে, ভাবেনি মহীম দাস। তাকেও বিপদে ফেলেছিল।

তবু মুখরক্ষা করেছে গৌরী।

মহীম দাস ক'দিনে সদরের-কলকাতার কাগজের লেখা সেই ফ্যাংশানের কথা, গৌরীর গানের সমালোচনা, মায় দেবকণ্ঠবাবুর ঘরানার সমন্ধে যা লেখা হয়েছে, সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছে। এগুলো দেখালে খুশী হবে দেবকণ্ঠ।

মহীমের মনে হয়, যে সম্মান পাওয়ার কথা ছিল, দেবকণ্ঠ বাবু তা পাননি। লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন তিনি, আজ তাঁর দিকে লোকের দৃষ্টি পড়েছে ওই গৌরীর অনুষ্ঠানের পর থেকেই।

গ্রামের পথে কোথায় বকুলের সুবাস ওঠে। বাঁশ বনে একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। শান্ত পল্লীর বুকে রেওয়াজের সুর ওঠে। দেবকণ্ঠবাবু রেওয়াজ করছেন। এটা এখানেও প্রতিদিন করেন। আর গৌরী—ললিতের রেওয়াজের সময়ও সুরটা মাঝে মাঝে ধরে আলাপ করেন। এখনও নিখুঁত-গায়কী সুরেলা-গলা কোথাও বয়সের এতটুকু জড়তা বিবর্ণতা নেই।

মহীম দাসের মত কঠিন বাস্তববাদী লোকের মনের গভীরে সুরটা একটা অনুরণন তোলে।

মহীম আশান্বিত হয়ে গিয়ে প্রণাম করে দেবকণ্ঠবাবুকে। সুর থামিয়ে সে চাইল। গৌরী বলে—বসুন কাকাবাবু।

মহিম বলে—বসছি, একটা জরুরী কাজে আসতে হল মা।—দাদা, দেখুন গৌরীর গানের খবর বের হয়েছে কাগজে।

দেবকণ্ঠবাবু চাইলো ওর দিকে।

গৌরীও একটু আগ্রহ নিয়ে দেখছে খবরগুলো, শহরের কোন পত্রিকা তার ছবিও ছেপেছে, আর দেবকণ্ঠবাবুর কথাও লিখেছে অনেকখানি।

দেবকণ্ঠ বাবু দেখছেন লেখাগুলো।

তাঁর কথা এতদিন কেউ লেখেনি, ওরা সবাই তাকে ভুলেই গেছলো। কিন্তু এবার গৌরীর জন্য তাঁর নামও করছে লোকে। নোতুন ভাবে তার সঙ্গীতের ধারাকে মূল্যায়ণ করতে চাইছে।

মহীম দাস দেখেছে দেবকণ্ঠ বাবুর চোখ মুখের পরিবর্তনটা। বলে সে—ডি এম সাহেব এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। গৌরীর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

অবাক হয় দেবকণ্ঠ।

ঠিক যেন ভাবতে পারে না। মহীম দাস বলে।

—জেলার নামী শিল্পীদের কথা জানতে চান, নিজের রেকর্ডিং মেসিন এনেছেন, কিছু রেকর্ডও করতে চান তোমার গান।

গৌরীও খুশি হয়।

দেখেছে এতকাল বাবাকে অবহেলিতের মত পড়ে থাকতে এই গ্রামের অন্ধকারে। কোন স্বীকৃতি নেই। আজ তাই এই খবরে খুশি হয়েছে গৌরী সব থেকে বেশি।

সে বলে—বেশ তো। বাবা তুমি গাইবে। কিন্তু ওকে দেখেছি সেদিন। দারুণ ভালো লোক। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের মত গোমড়া-মুখো নন। আর গানের সমঝদার।

দেবকণ্ঠ বাবু মেয়ের খুশি ভরা কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলেন।

তার সঙ্গীতের ধারা, এ গ্রামের কথা—সব মিলিয়ে একটি বিস্মৃত যুগের কথা যেন আজ জানতে চায় একটি তরুণ সঙ্গীত শ্রোতা—গায়কের।

দেবকণ্ঠ বাবু অবাক হন—উনি ডি,এম, হয়ে এই সব কথা ভাবেন মহিম?

মহীম দাস বলে—হ্যাঁ দাদা। নিজেই সেদিন জানালেন এখানে

আসার কথা। তাই সঙ্গে আনলেন আমাকে। এ গ্রাম দেখার জন্য, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য।

...দেবগ্রামের অতীত ইতিহাস নবাব হোসেন শাহ্-এর আমলের কোন সঙ্গীত গুরুর এখানে প্রতিষ্ঠা ও তারই ইতিহাস থেকে সুরু করে একটা বিশিষ্ঠ ধারাকে তুলে ধরেছেন তিনি। এখানকার সামন্ত রাজাদের অবদান নিয়েও লিখেছেন। দেবকণ্ঠের মনে হয় অতীতের অন্ধকার যবনিকার আড়ালে হয়তো তেমনি সত্য কিছু ছিল। সেই মৌন মূক অতীতের বুক থেকে অনির্বাণ একটি সুরের প্রদীপকে তারা সঙ্গোপনে প্রজ্বলিত করে রেখেছে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের মত।

মহীমবাবু বলে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বৈকালে। মহানন্দ বাবুদের ওখানেও যাবেন। কি সব ইতিহাস ঘেঁটেছেন মহাফেজখানায়, তাই এসেছেন এখানে।

অবাক দেবকণ্ঠ—কি বলছো মহীম? এসব নিয়ে খোঁজখবর কেউ করে? লাভ কি?

মহীমবাবু বলে—সে ওই পাগল সাহেবকেই বলো দাদা। সেদিন গৌরীর ঠুংরী শুনে সাহেব বলে—এ তো আসলি জিনিস। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার বন্দেজী গান—দেবগ্রামে এল কি করে?

মহীম দাস বলে—এবার সদরে উনি কলকাতার খবরের কাগজের লোকদেরও ডাকছেন। তোমাকেও অনুষ্ঠান করতে হবে সেখানে। তুমি বাবু 'না' করো না। শুনলাম একটি সরেস শি

দেবকণ্ঠও আশা রাখে ললিতের ওপর। মহীম বলে।

—গৌরী, ওই নোতুন ছেলেটিকে নিয়ে এবার চলো। মহীম দাস এবার বুঝেছে দেশের লোক কি খুঁজছে। তোমাদের।

হারান আদক-এর দলবলকে দেখে ডিএম সুবিনয় বাবু চাইলেন। ব্লক অফিসারই পরিচয় :করিয়ে দেন—এখানে নাম করা বিজনেস ম্যান এরা, ইনি হারান বাবু, হারান আদক। ইনি জানকী বাবু—এখানের ডাক্তার সতীশবাবু। হারান আদক ছেলেকে এবার টেনে আনে সামনে।

গদগদ স্বরে বলে—আমার ছেলে বিনোদ স্যার। এখানের ইতিহাস,মন্দিরের কথা—ওই যে লোকসঙ্গীত-টঙ্গীত,এখানের গানের যা ঘরাণা বলছেন। এ সব খবর সে রাখে। এটা ওটা করে।

সুবিনয়বাবু চাইলেন বিনোদের দিকে।

বিনোদ সকাল বেলাতেই আজ একটু চড়িয়েছে। তাই মেজাজটা ভালো আছে, আর ভবনাথও সঙ্গে এসেছে। সেও এখন মেজাজে রয়েছে। বিনোদ বলে।

ভবনাথও এখানের নামী গাইয়ে স্যার। আজ তাহলে সন্ধ্যায় এর অনুষ্ঠানও শুনুন।

হারান আদক এই সুযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে হাতে আনতে চায়। তাই বলে সে—যদি কিছু মনে না করেন, আমার একটা ছোট খাটো এটাচড্ বাথ, গেষ্ট হাউস আছে, ইলেকট্রিকও আছে, ফার্নিশ্ডও করিয়েছি। ওখানেই উঠলে খুশী হবো স্যার। আরামে থাকবেন।

বিনোদ বলে।

আমি বাউল দু'এক-জনকে বলে রাখছি, রায় বেশে নাচও হতে পাবে, আর দেবগ্রামের ক্লাসিক্যাল গানের আয়োজনও করবো।

সুবিনয়বাবু বলেন—সেই গৌরী দেবী তাঁর বাবা দেবকণ্ঠবাবুর গান-এর ব্যবস্থা হবেতো? ওদের গান শুনতে চাই।

বিনোদ একটু গুম হয়ে যায়।

সুবিনয়বাবু বলে চলেছেন—এখানের জমিদার বাড়ির ইতিহাস,

ওদের দু-একজনকেও চাই। এখানের রায়চৌধুরী বাবুদের কে একজন আছেন—তাঁকেও দরকার।

বিনোদ-হারান আদকের মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে। বিনোদ জানে, ওরা কেউ হয়তো ওখানে আসবে না। তাই বিনোদ বলে।

—ওই ঘরেরই সেরা গাইয়ের গান শোনাবো স্যার। এই যে ভবনাথ—বিরাট ওস্তাদ। দেবগ্রামের সব খানদানী জিনিস এর গলাতেই পাবেন।

সুবিনয়বাবু হঠাৎ ভবনাথকে দেখে অবাক হন। চেনা মুখ—লোকটার বাবরি চুল—ওই বাহারের পাঞ্জাবীটা চেনা মনে হয়। খেয়াল করতে পারেন সেই অনুষ্ঠানের রাতে সদরে একে দেখেছিলেন মত্ত অবস্থায় গাছের নীচে। পুলিশ ডেকে ভিড় হঠাতে হয়েছিল।

আজ ওকে দেখে আর বিনোদের মুখে ওর কথা শুনে তাই ঘাবড়ে গেছেন। নিমেষের মধ্যে বুঝে নিয়েছেন তিনি ব্যাপারটা। এদের টাকা আছে—সমাজের সব কিছুই এরা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের জিম্মায় এনেছে। মায় অতীতের ঐতিহ্য—সংস্কৃতি সব কিছুকেই এরা দখল করে নিতে চায় এদের বিকৃতি দিয়ে তাকে বিকৃত করে তুলতে চায়।

হারান আদক বলে—তাহলে আমার কুঁড়ে ঘরেই পায়ের ধুলো পড়ুক স্যার। আমি সব আয়োজন করছি।

এমন সময় মহীম দাসকে ফিরতে দেখে চাইলেন সুবিনয়বাবু। মহীম দাস বিনোদ ভবনাথকে দেখে অবাক হয়।

—তোমরা !

বিনোদ বলে—এলাম স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। আজ আমাদের গেষ্ট হাউসেই উঠছেন উনি—ভবনাথবাবুর গান শুনবেন ওখানেই।

মহীম দাস অবাক হয়েছে।

—তাই নাকি! ওদিকে বলে এলাম দেবকণ্ঠবাবুকে। ওঁরাও আসবে—কিন্তু—

সুবিনয়বাবু সারা জেলার পরিচালনা নিয়ে মাথা ঘামান। মানুষ চিনতে তাঁর দেরী হয় না। তাই ব্যাপারটার কোথায় একটা গোলমাল আছে সেটা বুঝে নিয়ে বলেন।

—হারানবাবু আমি ডাকবাংলোতেই থাকছি। আপনার ওখানে এবার ওঠা হল না। কিছু মনে করবেন না। কারণ এখানে জায়গা একটু বেশী, আর নিরিবিলি। শুনছেন তো গান-টান হবে। জায়গার দরকার। আর থাকার ব্যাপারে আশা করি এবার বিব্রত করবো না। পরে এলে দেখা যাবে!

হারান আদক বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে—বড় আশা করছিলাম স্যার থাকবেন ওখানে।

বিনোদও ব্যাপারটা বুঝেছে। মহীম দাস দেবকণ্ঠ মহানন্দবাবুরা চায় না তারা হুজুরের সান্নিধ্য লাভ করুক। ভবনাথও চুপসে গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেন।

—পরে এলে উঠবো ওখানে। এবার যেতে পারলাম না। মাপ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই সুবিনয় বাবু ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদা নিয়ে বলেন—জরুরী কাজ আছে। নমস্কার।

অর্থাৎ হারানবাবু বিনোদবাবুদের যে এখানে আর কোন দরকার নেই, সেই কথাটাই কঠিনভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

সুবিনয়বাবু আপিসের খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে বলেন ব্লক অফিসারকে। —এরাই এখানের সবকিছু ব্যবসাপত্র দখল করেছে, না? অনেক টাকা ওদের?

ব্লক অফিসার ভদ্রলোক মাথা নাড়েন। ব্যাপারটা সত্যিই।

সুবিনয়বাবু বলে উঠেন।—তাই সব কিছুরই জিম্মাদার সাজতে চায়।

ব্লক অফিসার জবাব দিলেন না। এখানে যে হারান আদকদেরই রাজ্য সেটা তিনিও জানেন। ওদের চটিয়ে এখানে চাকরি বজায় রাখা মুস্কিল। কিন্তু ডি, এম, সাহেব সেইখানেই কঠিন ঘা দিয়েছেন।

ললিত ক'মাস এখানে যেন কি সাধনায় ডুবে আছে। এক নিরলস সাধনা।

ভোর থেকে উঠে এই ধ্বংসপুরীর মাঝে সে আনে কি সুরের রেশ। বড় বাড়িগুলোকে ঘিরে থমথমে অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। দীঘির ধারের বাগানের গাছ-গাছালিতে পাখীদের ঘুম ভাঙা সেই সুরে।

মহানন্দবাবুর ভোরে ওঠা অভ্যাস। ললিতের আশাবরীর ভৈরোঁর সুর তার কাছে সুরময় হয়ে ওঠে। তোড়ি, বিলাস খানি টোড়ির সুরে সকালের সোনারোদ গেরুয়া হয়ে উঠে।

দুপুরের অলস রৌদ্রদগ্ধ মাটির বুকে ওঠে মাড়োয়ার সুর— ক্লান্ত অপরাহ্ণে জাগে ভীমপলশ্রী, জয় জয়ন্তীর উদাস সুর।

দিন শেষ হয়ে আসে, নির্জন ধ্বংসস্তূপে কি অতীতের বেদনা নিয়ে মূর্ত হয় ইমনের আলাপ। রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে করুণ বেহাগ। ললিত-এর মূর্ছনা জাগে। এখানে শুদ্ধ পরিবেশে ওই ললিত যেন জাগর প্রহরী। ওর সুরের পরশে এখানের দিন-গুলো ভরে উঠে পূর্ণ হয়ে। হারিয়ে যায় এক একটি দিন।

...বাসনা দেখেছে ওই ললিতকে। সকালে সে বাগানে পুজোর ফুল তুলতে যায়। তখনও বাগানের গাছ পাতায় ফিকে আঁধার জড়িয়ে থাকে।

ললিতের কণ্ঠে জাগে যোগিয়ার সুর।

পিয়া সনে মিলন কি আশ
সখিরে।

দিনে দিনে বাড়ত মোরে
সাগর যৌবন—

কোন চির বিরহিনীর করুণ বিয়োগ ব্যথা চিরন্তন হয়ে ওই ভোরের সুবাস মাখা বাতাসে গুমরে ওঠে।

চমকে দাঁড়ায় বাসনা। এ যেন তার ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনের হাহাকারই সুরে সুরে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুরের রেশ ওর সারা মন কি রিক্ততার বেদনায় ভরিয়ে তোলে। বাসনার মনে হয়েছে বার বার জীবনে সে কিছুই পায় নি। কবে বিয়ে হয়েছিল, কটি দিনরাত্রি তার কাছে স্বপ্ন হয়ে আছে। তার স্বামী হঠাৎ মারা যায় বিয়ের কদিন পরই। সব হারিয়ে এখানে ফিরে এসেছিল বাসনা।

জীবনে আর বসন্ত আসে নি। ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে গেছে কতো দিন কতো রাত্রি। জীবন তার কাছে একটা বোঝা মাত্র।

বাসনা এখন ভোরের আঁধারে আসে বাগানে। ওই এঁদো ঘরখানার দিকে চেয়ে থাকে—ললিত রেওয়াজ করছে চাতালে বসে। ওর প্রশান্ত মুখে পড়েছে দিনের প্রথম আলো। বাসনা কি ভাবছে!

ব্যাপারটা সেদিন যেন কিছুটা প্রকাশ পেয়ে যায় লখিয়ার কাছে। লখিয়াও ললিত এখানে আসার পর থেকে একটু স্বস্তি পেয়েছে।

রামু এখন দিনভোর বাজারের ঝুপড়ি দোকানে বেচাকেনা সেরে সন্ধ্যায় ফিরে এসে চাতালে বসে! ললিত তখন আলাপ করছে। কোন কোনদিন কাজরী চৈতি ঠুংরীও গায়। রামু এককালে বেনারসে ডালকা মন্দীর কোন বাঈজীর ওখানে ছিল। ফলে তবলাও বাজাতো। পরে এখানে সে ঢোলক পিটে মদ গিলে চেল্লাত। তবু রামু ওস্তাদজীর সন্ধান পেয়ে এবার বদলেছে। নিজেই তবলা টেনে নিয়ে বসে—চালাও মেরা ওস্তাদ।

তবলায় বেনারসী ঘরানার বোল উঠতো।

লখিয়া দেখেছে রামু বাজে লোকদের সঙ্গ ছেড়ে এখন অনেক

বদলে গেছে। মদ গিলে মাতলামী করে না। শান্তিতে আছে লখিয়া। দুটো পয়সাও জমাতে পেরেছে হাতে। অন্য সময় মদের জন্য মারধোর করে ও লখিয়ার দুধ বেচা টাকা কেড়ো নিতো।

রামু হাঁক পাড়ে—এ লখিয়া, ওস্তাদজীর জন্য মালাই বানাবি আজ। রোটি সবজী আউর মালাই। বহুৎ মিঠা গায়া আজ মেরে ওস্তাদ।

...রামু নিজেই কানে হাত চেপে গাইতে থাকে কাজরীর মুখড়া।

আজ যা বালম পরদেশী।

জিতা রহো মেরে ওস্তাদ!

রাত্রে লখিয়া রামুর চাপে পড়ে ললিতকে এখানেই খেতে হয়। টাকা দিতে গেলেও নেবে না। তবু ললিত বলে—কিছুতো নিবি!

রামু হাসে। ব্যস!—দশ রূপেয়া দেও ওস্তাদ। পুরা হো জায়ে গা।

লখিয়া বলে—তুম হিঁয়া রহতা হ্যায় এ মেরা বড়া ভাগ্য ওস্তাদজী। ফিন পয়সাকা বাত করবে কাহে?

...ললিত এতদিন দেখেছে তাদের বাড়িতে এই হৃদ্যতার ছোঁয়া পায় নি। অর্থের অভাব তাদের নেই। অপচয়ই হয় সেখানে। তবু ললিতের মনে হয়েছিল তার দাদা বৌদিরা যেন প্রকারান্তে কথাটা জানাতে চেয়েছিল যে থাকতে খেতে গেলে টাকাও দিতে হয়। তাকেও রোজকার করতে হবে পরিশ্রম করে।

বাবা হয়তো এসব নিয়ে কোনদিনই ভাবে নি। তাদের সমাজেও দেখেছে ললিত ছিল যেন একটা ফালতু কেউ। তার জন্য সর্বত্র ছিল অবজ্ঞা-অবহেলা। সে কারখানার ম্যানেজারিও করে নি ব্যবসাতেও নামে নি। সমাজে তাই সে ছিল অপাংক্তেয়।

যাত্রার দলেও দেখেছে নিজেদের মধ্যে নানা দলাদলি। টপ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শাহান শাহী মেজাজ।

সব কিছু ললিতের কাছে বিশ্রী লেগেছিল। আজ এখানে এসে

ললিত নিজের ঠাঁই যেন খুঁজে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে নিজের পরিচয়। গৌরীকে দেখেছে।

শান্ত সহজ মেয়েটির নিষ্ঠা সাধনা তাকে মুগ্ধ করেছে। দেবকণ্ঠবাবু এনেছে তার মনে শিল্পীর জীবনবোধ।

দেখেছে রামু লখিয়ার মধ্যে সহজ মানবিকতা। এদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা শ্রদ্ধা ললিতকে যেন পথ দেখিয়েছে। সাধনার পথ।

বাসনাকে দেখেছে ললিত দূর থেকে। ভোরের আবছা আলোয় দেখা যায় তাকে, বাগানে ফুল তুলতে আসে। লখিয়াও সেদিন দিদিমণিকে দেখে এগিয়ে যায়। বাসনা বলে।

—ডালটা একটু নুইয়ে ধর লখিয়া। ফুলগুলো তুলে নিই।

লখিয়া শক্ত হাতে ডালটা টেনে ধরেছে। ফুল তুলতে তুলতে বাসনা শুধোয়—তোদের ওস্তাদ কি দিনরাত চেল্লায় রে।

হাসে লখিয়া—না দিদিমণি, বহুৎ বড়া ওস্তাদ ও! আর বহুৎ আচ্ছা আদমী। এখানে আছে—মনে হয় এ ঠাঁই পবিত্র হয়ে গেছে।

—তাই নাকি রে?

বাসনার ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। লখিয়া বলে।

উ গতিরাম ঠাকুর বাবুকে ঠিকসে খেতে দেয় নি মালুম। সেদিন দেখলো—স্রেফ ডাল-ভাত আউর একঠো কি সবজী দিল। ব্যস—বাকী সব আচ্ছা চীজ ঐ নিয়ে ভাগলো। বড়াবাবুকে থোড়া বলবেন দিদিমণি?

গতিরাম সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছে বাসনা। নিজে মন্দিরে বড় একটা থাকে না পুজোর পর। বাসনা তবু বলে।

—ও ঠাকুরমশাইকে বলে না কেন?

লখিয়া শোনায়।

—ওস্তাদজী বহুৎ ভালা আদমী দিদি, খানে কো নেহি দেনে সে ভি কুছ বোলবে না। দু'এক রোজ সে ভি না খেয়েও থাকে দিন

ভোর। রাতকো হম রোটি পাকায়ে দিই তো খেলো—ব্যস। না দিলে বলবে না কুছ।

বাসনার মনে হয় বাবা ওকে ঠাই দিয়েছে, অতিথি। বাসনা এ নিয়ে কিছুই দেখে নি। হয়তো সত্যিই কষ্ট হয় লোকটার। আর তন্ময় হয়ে থাকে গান নিয়ে, ও সব ভাবার মত মানসিক অবস্থাও তার নেই। তাই কষ্ট সহ্য করেই থাকে।

বাসনা চুপ করে কি ভাবছে। এতদিন এই বন্দী হয়ে থেকে বাসনাব মনের সব কিছু ভাবনা চিন্তাগুলোও যেন চার দেওয়ালের মধ্যে সীমিত হয়েছিল। আজ মনে হয় তারও করার কিছু আছে এই ব্যাপারে।

গয়াগতি ভট্টাচার্যও শুনেছে ওই ললিত সম্বন্ধে নানা কথা।

ভবনাথ তার ভাইপো, ওটা যে জাহান্নামে গেছে তা জানে—তবু শুনেছে ভবনাথের মুখেই। মহানন্দবাবু—দেবকণ্ঠবাবুদের জন্য আর গৌরীর জন্যই ভবনাথ মুখ কালো করে সদর থেকে ফিরেছে। আর ওই যে ললিত এসে রয়েছে, ওই ভবনাথের সব চেয়ে বেশী শত্রু।

গয়াগতি মনে মনে খুশী হয় নি ললিতকে এখানে খেতে বসতে দেখে। কিন্তু ললিতের কাছে মাঝে মাঝে দু'দশ টাকা পায়, তার জন্যও ওকে কিছু বলতে পারে না। ঠাকুরবাড়ির প্রসাদের ভাগ দিতে হয় তাকে বাধ্য হয়েই।

হঠাৎ গয়াগতি আজ সকালে বড়বাড়ির খাস ঝি কুসুমকে মন্দিরে আসতে দেখে চাইল। কুসুম দেখছে তরকারী কোটা, দুচারটে ঝিঙে ধুঁদুল—পুঁই ডাঁটা—কুমড়ো দিয়ে একটা তরকারী, কয়েকটা ভাজা আর হড়হড়ে ডাল। এই দিয়েই ভোগের আয়োজন করছে ঠাকুরমশাই।

কুসুম বলে—কি গো ঠাকুরমশাই, দেবতার এই ভোগ হচ্ছে নাকি? দুধ ছানা পরমান্ন—এসব কই?

গয়াগতি একটু ঘাবড়ে যায়। বলে সে—

ওসব পরে হবে। তা কুসুম হঠাৎ এদিকে? ভালো আছিস তো?

কুসুম বলে ওঠে।

—এলাম। দিদিমণি পাঠালে দেখেশুনে যেতে। তা বাপু ঘণ্টা নেড়ে ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে সব সাবড়াচ্ছো দেখছি।

গয়াগতি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে।

—কি যে বলিস? দিন কাল যা পড়েছে। তুই বল কুসুম—দশ টাকা দৈনিক খরচায় কি হবে? তার ওপর একজন অতিথিও রয়েছে বাড়তি।

হাসে কুসুম।

—ওর জন্যই এই ঘ্যাটের বহর—না গো? তা লখিয়া বলছিল, সে বাবু তো তোমাকে ট্যাকা দেয়। মাগনা তো খায় না।

গয়াগতি বুঝেছে ব্যাপারটা ওদের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে। তবু গয়াগতি মনের জ্বালাটা চেপে রেখে চাইল কুসুমের দিকে। টসটসে চেহারা, পানের রসে-হালকা ঠোঁট লালচে হয়ে উঠেছে। গয়াগতি আজ বেশ জোরের সঙ্গেই বলে।

—এইসব কথা রটেছে বুঝি? কুসুম জানায়—হ্যাঁগো। গয়াগতি বলে—লখিয়া বলেছে ওই কথা? আমি ট্যাকা নিই ললিতবাবুরকাছে?

কুসুম গা-গতর ছুলিয়ে হেসে বলে—না। তুমি কি বলো ট্যাকার কথা? উনি দেন, তাই না করতে পারো না। তা যাক্ গে—ওই বাবুর জন্য আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না।

গয়াগতি আশ্বস্ত হয়। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে শুধোয়।

—কেন রে? বাবুর তাহলে পাঠ উঠলো দেবগ্রাম থেকে? তা ভালো বাপু, চেনা জানা নেই—হুট করে এসে গেড়ে বসবে এ ক্যামন কথা? বড় কত্তার দয়ার শরীর—তাই বলে ঠকাবে তাঁকে? আপদ বিদেয় হ'ল তাহলে?

কুসুম বলে।

—না গো। উনি রইলেন। আর ওর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে ɪাবাবুর ওখানেই!

এবার গয়াগতি হাঁ করে চেয়ে থাকে—কি বলছিস রে?

কুসুম জানায়—হ্যাঁ গ। তুমি বাপু এবার হাবতাকে বুড়ো আঙ্গুল খিয়ো না। যাই—বাবুকে খবরটা দিই-গে যাই।

মহানন্দবাবুরও ক্রমশ ললিতের সম্বন্ধে এখন ধারণা বদলেছে। ত্যিকার গুণী সে। আর দেখেছে মহানন্দ চৌধুরী গান বাজনার ইনে থেকে—যাত্রার দলে যাযাবরের মত ঘুরেও কোন নেশা ভাঙ র না ললিত। বরং রামুর মত বেহদ্দ মাতালও মদ গেলা কমিয়েছে ই ললিতের সঙ্গে মিশে।

আজ বাসনাকে সকালে এসে কথাটা পাড়তে দেখে একটু অবাক। মহানন্দবাবু।

বাসনা বলে—ভদ্রলোককে নিয়ে তো খুব নাচানাচি করছো বাবা, কোথায় থাকে—কি খায় তা কি জানো? ওই ললিতবাবুর থা বলছি।

মহানন্দবাবুও কথাটা তলিয়ে ভাবে নি। এতক্ষণে খেয়াল হয় তার। াগতি একবেলা যা খেতে দেয় সেটা আতপ চালের পিণ্ডি আর রিমিষ্টি ঘ্যাঁট মাত্র, রাত্রে মন্দিরে শীতল প্রসাদের আয়োজন থাকে মমাত্র। তা দিয়ে একটা মানুষের রাতের খাওয়া হয় না। ললিতও নিয়ে কিছুই বলে নি। মনে হয় রাতে বোধ হয় খায় না সে। ানন্দবাবুর কথাটা এবার খেয়াল হয়, ওই ললিতের এ সব য়োজনের কথা তো ভাবেনি সে।

তাই মেয়েকে কথাটা তুলতে সেও লজ্জা বোধ করে। মহানন্দ-বলে।

—সত্যিই তো। কথাটা একবারও আমাকে কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় নি। ওই ললিতও নিজে জানাতে পারতো।

বাসনা বলে।

—বোধ হয় সত্যিকারের ভদ্রলোক ওই ললিতবাবু। তাই এসব কথা জানাতে চায় নি। শুনলাম লখিয়াই কোন কোন দিন দু'চারটে রুটি—তরকারী দেয় ওকে। তবেই খেতে জোটে।

এ যেন বড়বাড়ির লজ্জা। অতীতে লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ অঞ্চল থেকে এ বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছে কত শিল্পী, তাদের বরাদ্দও দেখেছে মহানন্দবাবু। আজ একজন অতিথি-শিল্পীকে তারা যেন চরম অপমান করে চলেছে।

মহানন্দবাবু বলে—একটা ব্যবস্থা তো করতে হয় মা। আর ললিতই বা কেমন ?—আবে বংশী, ডাকতো ছোকরাকে!

বাসনা বলে ওঠে—থাক। আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই বেচারা রেওয়াজ করছে করুক। আমি দেখছি। আজ থেকে ও এবাড়িতেই খাবে বাবা, তুমি কি বলো ?

মহানন্দবাবু খুশী হয়। এইটা যেন সেও চেয়েছিল। তাই বলে।

—এই-ই ভালো মা। বেচারা সত্যি কষ্ট পাচ্ছিল।

ললিত কথাটা শুনে অবাক হয়। কুসুম এসেছে ওর ঘরে সামনে। বলে সে।

—বাবু বললেন গো আজ থেকে ওই বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া ব্যবস্থা হবে। আর তোমাকেও বলি বাপু, ওই দোসাদ মাগীর হাতে রুটি তরকারী খেলে কি করে ? বামন মানুষ। গলায় পৈতেও দেখছি

ললিত চাইল ওর দিকে। লখিয়ার কথা বলছে সে।

ললিত বলে—জাত কি গায়ে লেখা থাকে ? দিব্যি সাফসুতরো করে খাবার এনে দিল। খেতে দোষ কি ?

কুসুম আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লখিয়াকে দূরে দেখে থেমে গেল।

বলে সে—দুপুরে চলে আসবে। আর এই ঘরটা বদলাতে হবে।

ললিতের ভালো লাগে এই মুক্ত পরিবেশ। দীঘির জলের বিস্তারে পদ্মফুল ফুটে থাকে। দেবদারু গাছের বাতাসে আনে কি স্নিগ্ধতা। পাখীর ডাক শোনে সে চাতালে বসে। ওই স্তব্ধ সুর ভরা জগতের মাঝে নিজের অস্তিত্বটুকু খুঁজে পায় সে। তাই ললিত বলে।

এখানেই আরামে আছি। বড়বাবুকেই জানাবো কথাটা।

মহানন্দবাবু ওর এখানে থাকাটা তাই মেনে নিয়েছে।...ললিত অবাক হয়। দুপুরে খেতে বসেছে মহানন্দবাবুর সঙ্গে। আজ বহুদিন পর সে যেন ঘরের খাবার খেতে পেয়ে খুশী হয় মনে মনে। আর মহানন্দবাবুর বাড়িতে হঠাৎ তার আতিথ্য জুটে গেল কি প্রকারে সেটা ভাবতে থাকে।

—আর চাট্টি ভাত দিই। লজ্জা করে খাচ্ছেন নাকি?

কথাটা শুনে চাইল ললিত।

হাল্কা রং-এর শাড়িতে ওকে মানিয়েছে চমৎকার। সদ্য স্নান সেরে এসেছে, চোখে মুখের কমনীয়তাটুকু সহজেই নজরে পড়ে।

ললিত ওকে দূর থেকেই দু'একবার দেখেছিল। ভোরে বাগানে ফুল তুলতে দেখেছে বাসনাকে। লখিয়াই ওর পরিচয়টা দিয়েছিল।

মহানন্দবাবু বলে ওঠে—বাসনাকে তুমি চেন না ললিত? আমার মেয়ে।

ললিত কোনমতে জানায়—আর কিছু দরকার হবে না।

বাসনা শেষপাতে দইটা দিয়ে বলে।

—কিছু তো খেলেন না।

মহানন্দ চৌধুরী বলে।

—খেতে হবে, বুঝলে ললিত! ওস্তাদ সাদিখাঁ বিরাট গাইয়ে,

গোয়ালিয়রের লোক—ইয়া দশাসই চেহারা! তিনি খেতে বসে প্রথমে ডালের বাটিতে আঙুল চুবিয়ে দেখতেন কতটা ঘি আছে। আধ ইঞ্চিটাক ঘি নইলে ওস্তাদের সেবাই হবে না। দমভোর গাইতে হবে—না খেলে চলে ?

বেলা হয়ে গেছে। ললিত একাই বসে আছে তার ঘরটায়। আজ হঠাৎ তাকে ওবাড়িতে আতিথ্য দেবার মূলে কে সেটা বুঝতে পেরে অবাক হয়েছে ললিত। ওই বাসনা যে তার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে তা জানতে বাকী নেই।

ওর শান্ত কালো চোখে যেন দীঘির গহন শীতল অনুভূতি, এই ধ্বংসপুরীর রহস্যের মতই কি অধরা রহস্য ওর সারা মনে। বাসনার সংযত ব্যবহারে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, তবু কোথাও আন্তরিকতার অভাব হয় নি। যাযাবর ললিত হঠাৎ উষর পথের ধারে যেন ছায়া তরুর আশ্রয় পেয়েছে।

বাসনা কদিন ধরেই কথাটা ভেবেছিল।

শান্ত সংযত নম্র ছেলেটিকে ও দেখেছে দূর থেকে। ওর গান শুনেছে। অপরূপ কণ্ঠ, আর গানে যেন যাদু আছে। বাসনার মনে হয় ছেলেটিও যেন তার মতই নিঃস্ব, রিক্ত বঞ্চিত।

কি বেদনা নিয়ে পথে বের হয়েছে। দেখতে শুনতেও সুন্দর মনে হয় কোন বড় বংশের ছেলে। আর পোষাক-আসাকও সাধারণ তবু সেই পোষাকেই ওকে মানায়।

বাসনা ওর সম্বন্ধে শুনেছে লখিয়ার কাছে কথাগুলো। লখিয়া বলে বহুৎ ইমানদার আদমী দিদি উ ললিত বাবু, বড়া খানদানকা লেড়কা।

বাসনা আজ দেখেছে ওকে।

খাবার সময় এসেছিল। কোনরকমে খেয়েই বের হয়ে যাচ্ছে। বাসনা বলে—পেট ভরলো কিনা তাও বললেন না ?

হাসে ললিত—ওটার জন্যই সব। না খেয়ে উঠবো কেন? বাসনা দেখছে ওকে।

শুধোয় সে—বাড়ি ঘর ছেড়ে এভাবে বের হয়েছেন কেন? বাড়িতে কে আছে?

ললিত একটু অবাক হয় বাসনাকে এসব প্রশ্ন করতে দেখে। মনে হয়, বাসনা যেন ধরে ফেলেছে তার মনের সেই বেদনাটাকে, যেটাকে ললিত সঙ্গোপনে রেখেছিল এতদিন। ললিত ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চায়। তাই বলে সে।

—আছেন অনেকেই, কিন্তু আমার ঠিক মন বসে না, তাই পথেই বের হয়েছি। এখানে পেয়ে গেলাম দেবকণ্ঠ বাবুর মত গুণী লোককে। রয়ে গেলাম, চলি।

বাসনাকে যেন এড়িয়ে গেল ললিত।

বাসনা একটু অবাক হয় নিজের এই ভাবান্তরে। এতদিন সে ছিল এই বড় বাড়ির পাষাণ কারায় বন্দী। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। তারও দরকার পড়ে নি কারোর জন্য ভাবার। কিন্তু আজ যেন ললিত এই বন্দীপুরীর অন্ধকারে এসেছে এক ঝলক আলোর মত বাসনারও ভাবনা হয় ওর জন্য।

তার আকাশ ভরা জীবনে ওই ললিত এনেছে অন্য একটি স্বাদ। এ তার কাছে নোতুন এক অনুভূতি। সুন্দর—বৈচিত্রময়।

বাসনার ব্যর্থ বঞ্চিত নিঃস্ব জীবনে কি সুর জাগে।

ললিতও ভেবেছে কথাটা। এখানে এসে সে শান্তিতে আছে।

দেবগ্রাম যে তাকে এভাবে আশ্রয় দেবে তা ভাবে নি। সকালের আলোটুকু ম্লান হয়ে আসে দীঘির জলে। পদ্মবনে সবুজ পাতার ভিড়ে গোলাপী পদ্মগুলো চন্দনের ছিটেফোঁটার মত ছড়িয়ে আছে। পাখীদের কলরব ওঠে।

ললিতের কাছে এই রূপময় শান্ত জগতে একটি হারানো দিনের উদাস বেদনা অপরাহ্ণের আলোয় ছড়িয়ে পড়ে। সুর ওঠে তার কণ্ঠে, জয়জয়ন্তীর আলাপ করছে সে। সুরটা কি বেদনার রং-এ দিনের বিদায় বেলায় ধূসর ধ্বংসপুরীর পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বেদনাই যেন চিরন্তন সত্য তার জীবনে। কোথাও কিছু পাবার ব্যাকুলতা নিয়ে যাযাবর ললিত কলকাতার জীবন—ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে পরিক্রমা করে চলেছে। সেই শূন্যতার বেদনাই ওর সুরে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ কাদের দেখে চাইল ললিত। বড় বাড়িগুলোর আড়ালে সূর্য নেমে গেছে—জায়গাটায় আবছা মুখ আঁধারি পরিবেশ। পাখীগুলো দীঘির ধারের বাগানের গাছে রাত্রিবাসের দখল নিয়ে কলরব করে বাতাস পদ্মবনের সুরভিতে আমন্থর।

—নমস্কার!

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন—আমি সুবিনয় ঘোষ।

মহীম দাস, ব্লক অফিসার আরও কারা সঙ্গে ছিল। মহীম দা পরিচয় করিয়ে দেয়।

—ইনিই ললিতবাবু স্যার। আর ইনি এখানের ডি এম মা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ললিত হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে চাতালের নীচে এসে ওর কাছে দাঁড়ালো।

দু'একটা তারার আভা জেগেছে। সেই আভায় ললিত দেখে ওই তরুণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। পরণে ধুতি পাঞ্জাবী। সরকারি তকমাও রাখেনি সঙ্গে।

সুবিনয়বাবু বলে—আপনার নাম শুনে এদিকে এসে ভাবলাম দেখা করে যাই। একটা লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রচারের চেষ্টা করে চলেছেন—তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ললিত দেখছে ওকে।

ওই ফাঁকা মাঠটুকুতে এর মধ্যে ভিড় জমতে সুরু হয়েছে। এর আগে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে এভাবে দেবগ্রামের পথে পথে ওই ধ্বংসস্তূপ. ওই ভাঙা মন্দিরের আশেপাশে ঘুরতে. ছবি তুলতে দেখে নি। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতেও দেখে নি। তাই এই সাহেবকে তারা দেখে অবাক হয়েছে!

রামুও বাজার থেকে খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে তাদের ঘরে। দারোগা-বাবু—কনস্টেবলরাও হুজুরের কাছ থেকে তফাৎ-এ থেকে যেন পাহারাদারী করে চলেছে।

রামু ঘরে ঢুকতে লখিয়া বলে দেয়—মেজেস্তর সাব ওস্তাদজীর সাথে ভেট করতে এসেছে। গানা শুনছে, বাতচিত করছে।

রামু তখন তার মদের পচানি হাঁড়ি সামলাতে ব্যস্ত! মাঝে মাঝে ওকর্ম এক-আধটু করে।

আজ খোদ জেলার কর্তাকে এখানে হানা দিতে শুনে সে দৌড়ে সে পচানির হাঁড়িতে খড় চট চাপা দিচ্ছে।

লখিয়া বলে।

—ক্যা বে দারুবালা—অব্ মেজেস্তর সাবকে বোলে, তু চাহাকা মাফিক দারু পিতা, আউর হম্‌কো ভি পিটতা? যাঁউ!

রামু ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আউর মদ খাই হামেশা? বোল তু?

রামু একটু প্যার করতেই যায় লখিয়াকে। মেয়েটা আদরে হেসে ওঠে!

—ভাগ্ বে। চল উধার। সাহেব-এর সঙ্গে ওস্তাদ ক্যামন বাত করছে দেখবি।

মহানন্দবাবুও খবর পেয়ে এসে পড়েছে। মাননীয় অতিথিদের নিয়ে মহানন্দবাবু চলেছে তাদের মন্দিরের দিকে। সুবিনয়বাবু বলেন।

—আপনাদের পুরোনো বংশ তালিকাটাও দেখাবেন। আর কিছু

আপনাদের পূর্বপুরুষদের কোনো সাবেকী রোয়দাদ দলিল যদি কি
থাকে। বিষ্ণুপুর-এর পর বাংলা-মুলুকে আপনাদের এখানেও এক
সংস্কৃতির ইতিহাস রয়ে গেছে। আমি তার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই
এই সঙ্গীতের ধারা এর কোন ইতিহাস যদি পাওয়া যায়।

রাত্রি নেমেছে। দেবকণ্ঠ এসেছে। আজ অনেক দিন পর হ
ঘরটায় গান-এর সুর ওঠে। গৌরী এসেছে। ললিত প্রথমে গাই
চায়নি ; কিন্তু দেবকণ্ঠের কথায় প্রকাশ্যে গাইতে বসেছে সে আজ এ
আসরে।

সুবিনয় বাবু তন্ময় হয়ে শুনছেন ললিতের গান। দেবকণ্ঠব
অবাক হন। তার ঘরের গায়কীকে আরও প্রাণবন্ত-রূপময় ক
তুলেছে ললিত তার প্রতিভা দিয়ে।

ললিতের সুরের আলাপ ভরিয়ে তুলেছে হলটা—অনেক দিন প
বাসনাও রয়েছে ওদিকে। আজ ওই সুরের ঝর্ণাতলায় ব
বাসনা নিজেকে চিনেছে। ওর বদ্ধ হৃদয়ের একটা রুদ্ধদ্বার যেন খু
গেছে।

গৌরী তন্ময় হয়ে শুনছে ললিতের গান।

মনে হয় এতদিন ধরে সে যা শিখেছে ললিতের তুলনায়
সামান্যই। ললিত এর মধ্যে এই ঘরাণার পুরো বন্দেজী মেজ
এনেছে দরবারীর সুরে। তার তানগুলো ফুলঝুরির মত ঝরে প
কি ঔজ্জ্বল্য প্রাণস্পন্দনের উল্লাস নিয়ে।

সুবিনয়বাবু শুনছে তন্ময় হয়ে, ওর বিদেশী টেপরেকর্ডারে সুর
বন্দী হচ্ছে।

বাসনা হারিয়ে গেছে তার হারানো কোন বেদনার গভীরে। এত
সে মুখ বুঁজে ছিল এই বন্দীপুরীতে। বাবাকে নিয়েই তার সংসা
সামান্যই কাজ। মনে হয়েছিল বাসনার, এ সংসারে তার করার
কিছুই নেই। চাইবারও কিছু নেই।

স্বামীকে মনে পড়ে অল্প, একটা মুছে যাওয়া স্মৃতির মত। অস্তিত্ব নেই, আছে বেদনার অনুরন। সবকিছু তার ফুরিয়ে গেছে ওই মানুষটির চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। জমিদার বাড়ির অত্যাচারী মত্তপ বংশধর তার জীবনকে বিষিয়ে দিয়ে গেছে। এ যেন বাসনারই লজ্জা।

বিধবা হয়ে এবাড়িতেই এসেছিল। স্তব্ধ নির্বাক একটি মেয়ে। মহানন্দবাবুও মেয়েকে দেখে মনে মনে গুমরে উঠেছিলেন।

বাসনা আজ তার মনের অতলের সেই সুর খুঁজে পেয়েছে। ললিতই যেন তার কাছে এনেছে নোতুন কাযের পরিবেশ।

আজ তার জন্যই স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এসেছেন এখানে। মহানন্দ চৌধুরী, দেবকণ্ঠ, হারানো সেই আনন্দের দিন—প্রতিষ্ঠার দিনগুলোকে ফিরে পায়।

বাসনা আজ নিজেই ওদের খাবার আয়োজন করে। মহানন্দ বাবু বলেন সুবিনয় বাবুকে।

—আজ রাত্রিতে এখানে কিছু গ্রহণ করতে হবে। আমরা একসঙ্গেই বসবো। ললিত, দেবকণ্ঠ সবাই! বাসনা—ব্যবস্থা কর মা।

আমার মেয়ে বাসনা।

বাসনা ডি, এমকে নমস্কার করে।

সুবিনয় বাবু বলেন—আবার আপনাকে বিব্রত করবো?

বাসনা বলে—বিব্রতের কি আছে? চলুন।

বাসনা আজ নিজের হাতে আর ঠাকুরকে নিয়ে এদের আপ্যায়নের আয়োজন করেছে। বেশ কয়েকজন অতিথিই রয়েছে।

গালচের আসন বিরাট থালা বাটি—আগেকার সেই বাসনপত্র বের করেছে! ললিতও অবাক হয়। দেখছে বাসনাকে। এই ব্যস্ততার মাঝে স্তব্ধ মেয়েটি আজ যেন মুখর হয়ে উঠেছে কি তৃপ্তিতে

ও যেন করার মত একটা কাজ পেয়ে খুশি হয়েছে। তারই স্পর্শ ওর চোখে মুখে।

বাসনা নিজেও পরিবেশনে হাত লাগিয়েছে।

—আর লুচি দিই ?

ললিত বাধা দেয়—না না।

গৌরী দেখছে ওদের। মহানন্দবাবু খুশিভরে বলে চলেছে।

—বুঝলে দেবকণ্ঠ, এবার ছাত্রদের নিয়ে বাইরে অনুষ্ঠান করো। উনি বলছেন—আর এখানের মিউজিক কলেজের ব্যাপারটাও তখনই ঠিক করা যাবে।

সুবিনয়বাবুও বলে।

—তাই চলুন। আমি দরকার হলে কলকাতা থেকে কালচারাল মিনিস্টারকেও নিয়ে আসবো। একটা কিছু করা দরকার। কাল থাকছি, একবার ডাকবাংলোয় আসুন ললিতবাবু।

মহানন্দবাবু বলে—যাবে বই কি।

গৌরী বের হয়ে আসছে। রাত্রি হয়ে গেছে। ললিতও চলেছে তার ওই ঘরটার দিকে। গৌরী তাকে দেখে দাঁড়ালো।

গৌরীর চোখের তারায় রাতের তারার ঝিকিমিকি ওঠে। গৌরী ললিতের আস্তানাটা দেখে বলে।

—বেশ বহাল তবিয়তে আছেন দেখছি।

ললিত চাইল ওর দিকে। গৌরীও দেখছে ওকে। চঞ্চল মেয়েটি ললিতকে মাঝে মাঝে বিব্রত করে ওর ধারালো কথায়। মেয়েটি ঠিক যেন চেনেনি ললিত। গৌরী বলে—জমিয়ে রয়েছেন দেখছি।

—কেন ?

ললিত অবাক হয় ওর কথায়।

গৌরী হঠাৎ চঞ্চল হাসিতে ভেঙে পড়ে রহস্যময়ীর মত। ললিতের কাছে এমনি নির্জন অন্ধকারে গৌরীর এই বিচিত্র রূপ একটা প্রশ্ন আনে।

গৌরী বলে ওঠে—না। এমনিই বলছিলাম। এখন তো তুমি রীতিমত ভালোভাবে থাকতে পার। গ্ল্যামার এসেছে। যাত্রার দলেও এই পজিসন পাও নি।

গৌরীর রূপের অভাব নেই তাই হয়তো তার সচেতন মন মাঝে মাঝে এমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মুখের ওপর এসব কথাও বলে বসে ওই তেজী মেয়েটি।

ললিতের চোখে গৌরী তাই একটি বিচিত্র চরিত্র। বাসনার সঙ্গে তুলনাও করেছে সে।

গৌরী অনেক চঞ্চলা, আবেগময়ী। ওর মনের অতলে রয়েছে অনেক কিছু পাবার জ্বালা— অতৃপ্তি। তার ব্যক্তিত্বের ওই পাওয়ার কোন তৃষ্ণাই মেটে নি। তাই এতও জ্বালা তার মনে।

তার তুলনায় বাসনা অনেক অনেক শান্ত। ওর চাওয়ার কিছু নেই—নিজেকে দিয়েই যেন সে তৃপ্ত।

গৌরী বলে—এখন মিউজিক কলেজের প্রফেসারও হয়ে যাবে। তাছাড়া বাবা বলে, তুমি নাকি অপূর্ব গাও। কলকাতার সমাজ তোমাকে লুফে নেবে। তা হিসেব করেই দেবগ্রামের মাটিতে বসেছো তুমি।

গৌরীর কথায় অবাক হয় ললিত। ও বলে ওঠে।

—কোন কিছু পাবার লোভ নিয়ে এখানে আসিনি গৌরী। কোন মোহ আমার নেই।

—তাই নাকি!

গৌরীর দু'চোখে কৌতুকের ঔজ্জ্বল্য। ওর সারা দেহটা যেন সেতারের সুরের মাধুর্যে হাসিতে কেঁপে ওঠে।

ললিত বলে—হ্যাঁ। জীবনে অনেক কিছু পথের দু'ধারে ফেলে ছড়িয়ে আমি পথ চলি গৌরী। কোন কিছু পাবার মোহ আমার নেই। কেন তা জানি না—থাকলে হয়তো শান্তি পেতাম। ছোট

ঘরের সীমানায় বাঁচতে পারতাম স্বপ্ন নিয়ে। অভাব আমার হবে না।

গৌরী ওর বেদনাহত কণ্ঠস্বরে একটু অবাক হয়ে চাইল। হঠাৎ যেন তার অজান্তেই গৌরী তার মনে গভীর আঘাত দিয়েছে। গৌরীর খেয়ালী মন যে কেন এমনি ভুল করে জানে না। চুপ করে সে দেখছে ললিতকে। নিজেই অনুশোচনা ভরা স্বরে বলে গৌরী।

—রাগ করলে ?

সহজ হবার চেষ্টা করে ললিত। নিজের সম্বন্ধে কোন পরিচয় তার মনের কোন খুশী-অখুশীর কথা নিয়েও আলোচনা করতে চায় না। হঠাৎ ললিত যেন নিজেকে ওই মেয়েটির কাছে কোথায় মেলে ধরেছে।

গৌরী বলে ওঠে—তোমার সম্বন্ধে হয়তো কিছু না জেনেই ওকথা বোলেছি। আর নিজেকেই বা হেঁয়ালীর মধ্যে রাখো কেন ?

চমকে ওঠে ললিত। গৌরী যেন আজ তার কাছে অনেক কিছুই জানতে চায়।

গৌরী বলে—তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার কথা সত্যিই। এভাবে বাঁচার কথা তোমার নয়। কেন যে নিজেকে লুকিয়ে অজ-পাড়াগাঁয়ে এসে রয়েছো তার জবাবও তুমিই জানো। নিজেকে রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে চাও তাই এসব ধারণা হওয়া কি অন্যায় ? তোমার যাত্রার দলের সঙ্গে এখানে আসাটা কি বিচিত্র নয় ? তুমি গান এর আগে ভালোই শিখেছিলে—তবে এখানে এই ঘরাণার জন্য পড়ে থাকবে কেন ?

ললিত আশা করেনি গৌরী এভাবে তাকে প্রশ্ন করবে। আজ তার নিজের কাছেই এসব প্রশ্নের কোন উত্তর জানা নেই ললিতের।

ললিত চুপ করে কি ভাবছে। গৌরী বলে।

—তুমি এসব প্রশ্নের জবাব আর কাউকে না দিতে পারো —

কিন্তু আমার কিছুটা জানা থাকবে এর জবাব, এটা আমি ভেবেছিলাম।

ললিত ওর দিকে চাইল—গৌরী।

গৌরীর হু'চোখে টলমল অশ্রুর আভা। গৌরী বলে।

—আমাকেও এড়িয়ে যেতে চাও সেটা বুঝেছি। কিন্তু বাবাকে আঘাত দিও না ললিত। জীবনভোর বাবা হুঃখই পেয়েছেন, সব তার হারিয়ে গেছে। তবু শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার হঠাৎ আসা তোমার গান-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবার নোতুন স্বপ্ন গড়ার মূলে তুমি। তাই ভয় হয় ললিত! বাবা হয়তো আবার হুঃখ না পান।

মহানন্দবাবু-দেবকণ্ঠবাবুর গলার স্বর শুনে গৌরী সরে গেল। ললিত অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ মনে হয় গৌরীর কাছে তার অনেক কিছু যেন বলার আছে। কিন্তু ললিত এতদিন নিজেকে সঙ্গোপনে সরিয়ে রেখে এসেছে। হঠাৎ তাই কোথায় জড়িয়ে পড়ার প্রশ্নে সে সচকিত হয়ে উঠেছে।

নিজের নির্জন নিঃসঙ্গতা নিয়ে শিল্পীর জীবন সাধনার মধ্যেও সেই মুক্তির উদার আকাশে যেন ঝড়ের এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে।

গৌরী কি যেন জানাতে চেয়েছিল। সেটা ভালোবাসা না বিরক্তি—না অবিশ্বাস ঠিক বুঝতে পারে না ললিত। তবু সেই প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে।

লখিয়ার ঘুম আসেনি। মেয়েটা দেখেছে ওস্তাদজীর কাছে হোমরা চোমরা ব্যক্তিদের আনাগোনা।

রামুও খুশী হয়। তাদের মাঝে এতবড় একটা লোককে পেয়ে তারা ধন্য হয়েছে। রামু বলে।

—দেখ কেতনা এলেমদার আদমী মেরা ওস্তাদ। মেজেস্টর ভি আতা হ্যায়।

লখিয়া বলে—তব তু দারু কাহে পিকে মাতোয়ালা হোতা রে?

রামু গম্ভীরভাবে জানায়—অব না পিবো। সাচ্।

লখিয়া তখনও জেগে আছে। আবছা অন্ধকারে সে দেখেছে গৌরী আর ওস্তাদকে দাঁড়িয়ে কি কথা বলতে। অবাক হয় লখিয়া।

লখিয়া যেন নোতুন একটা কিছু দেখেছে। গৌরী দিদিমণির সঙ্গে ওস্তাদের ঘনিষ্ঠতা একটা আছে, তা অনুমান করে নেয় লখিয়া। ওদের দুজনের মাঝে মান-অভিমানের পালা চলেছে, এটা বুঝে সেও যেন কৌতূহলী হয়ে শুনছে ওদের কথাগুলো।

লখিয়া স্বপ্ন দেখে ওস্তাদজীর মত একটা গুণী লোক এখানেই ঘর বেঁধেছে, সুখী হয়েছে। গৌরীও সব দিক থেকেই ওস্তাদের যোগ্য, তাই লখিয়া খুশি মনে সরে গেল।

খবরটা রামুকে জানাবে কি না ভাবছে, পেট আলগা লোক ওই রামু, এখুনি সারা বাজার মাৎ করে দেবে নানা রং চড়িয়ে ওইসব কথা বলে। তাই চেপে গেল লখিয়া।

তবু তার চিরন্তন নারী মনে কৌতূহল জাগে। সেটা চেপে রেখে লখিয়া তার গোয়াল ঘরের দিকে গেল, গরুগুলো তদারক করতে।

রাত্রি হয়ে আসে। কাজ সেরে বাসনা এবার মুক্তি পেয়েছে।

বাসনা যেন এই বন্দীপুরীতে এতকাল বাঁচার কোন অর্থ না পেয়েই টিকে ছিল মাত্র। এখন হঠাৎ তার সারা মনে একটা সাড়া জেগেছে। নিজেই এর অর্থ জানে না; মাঝে মাঝে ভয় হয়। এ ভালোলাগার কোন সার্থকতা নেই। তবু মন মানে না।

এই বিরাট ধ্বংসপুরীতে নাকি লুকোনো রয়েছে অতীতের অনেক সম্পদ, আর সেই গুপ্ত ধনসম্পদের সন্ধান রয়েছে এখানেই। সেটাকে খুঁজে পেতে হবে বাসনাকে।

সেই সম্পদ কি তা জানে না হয়তো। অনেক টাকা—সোনা হীরে জহরৎ! অতীতের পূর্ব-পুরুষরা রেখে গেছে উত্তরপুরুষদের জন্য। কোন জ্যোতিষী বাসনার হাত কোষ্ঠী দেখে নাকি বলেছিল, এই মেয়েই জানবে সেই সম্পদের সন্ধান।

বাসনা সেদিন হেসেছিল। বিয়ের পর সব হারিয়ে শূন্য হাতে যেদিন ফিরেছিল এ বাড়িতে, সেদিন মহানন্দবাবু বলে তাকে।

—তুই এ বাড়ির লক্ষ্মী মা। পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত রাজার সম্পদ-এর সন্ধান জানবি তুই। তাই বোধ হয় তোর নিয়তি এখানেই এনেছে তোকে।

বাসনার দু'চোখে জল নামে। অশ্রুভিজে কণ্ঠে বাসনা বলেছিল।

—সব হারিয়ে ওই সোনা হীরে নিয়ে আমার কি হবে বাবা?

মহানন্দবাবু মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—সকলের জন্য তুই মা। তাই তোকে এই দুঃখের আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হতে হবে।

কথাগুলো আজও ভোলে নি বাসনা। মনে হয়েছে ক্রমশ এই বড় বাড়ির লোকজন, অসহায় বাবা—কুলদেবতা, এসব-এর দায়িত্ব তাকে তুলে দিয়েছে কোন অদৃশ্য দেবতা।

...কিন্তু ললিতকে দেখে মনে হয়েছে বাসনার এই অনুভূতি। এই মুক্তির স্বাদ এতকাল সে পায় নি।

ভোরে বাগানে ফুল তুলতে যাওয়ার অভ্যাসটা বাসনার অনেক দিনের। আজও গেছে সে। ললিত ভোরে উঠে রেওয়াজ করে—আজ তার সুর শুনতে না পেয়ে অবাক হয় বাসনা।

ললিত কাল রাতের কথাটা ভেবেছে। তার চোখের সামনে একটা নীরব প্রশ্ন জাগে। আরও অবাক হয়েছে ললিত কাল ওই নোতুন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখে। সুবিনয়কে এখানে দেখবে তা ভাবে নি। আরও অবাক হয়েছে সুবিনয় তাকে দেখে না চেনার ভান করে গেছে।

ললিত নিজের অতীতকে ভোলার জন্যই পথে পথে যাযাবরের মত ঘুরছে। কি বেদনাকে সঙ্গোপনে বয়ে বয়ে আর সেই পরাজয়ের বেদনাটা যেন তার চোখের সামনে রূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

...হঠাৎ তার শান্তির জীবনে এনেছে দুঃসহতার গ্লানি। কোন গ্রহের মত সে অসীম আকাশে ঘুরে চলেছে সেই জ্বালা বুকে নিয়ে।

সুরটা আজ আসে না। তানপুরায় হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ললিত। আজ সকালের আবছা আলো—পাখীর ডাক—গন্ধমাতাল বাতাসে তার মনে সুর আনে নি। এনেছে বেদনার গ্লানি।

...হঠাৎ বাসনার দিকে চাইল ললিত। অবাক হয় সে বাসনাকে দেখে। —আপনি!

বাসনা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল এখানে, ললিতের ঘরের সামনে।

ললিত দেখছে বাসনাকে। ভোরের আরক্তিম আলোর আভাস পড়েছে ওর মুখে। ডাগর দু'চোখে কি কমনীয়তার ছোঁয়া—শিশির ভেজা পদ্মফুলের পাপড়ির মত দু'চোখের পাতায় টলমলে আবেশ।

...বাসনা যেন তার মনের ব্যাকুলতাকে চাপতে পারে নি। কোনমতে জানায় বাসনা।

—রোজ গান শুনি। আজ গাননা শুনে ভাবলাম, শরীর খারাপ বোধ হয় আপনার। তাই খবর নিতে এলাম।

ললিত একটু অবাক হয়। তার মত লোকের খবর নিতে আসবে বড় বাড়ির এই মেয়েটি। একথা সে ভাবতেই পারেনি। ললিত জানায়।

—শরীর খারাপ হয় নি।

বাসনা ওর দিকে চাইল। কাল রাত্রে দেখেছে বাসনা গৌরীর সঙ্গে ললিতের ঘনিষ্ঠতা। দু'জনের চোখের তারায় একটা চাপা তৃপ্তির আভা, তার সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় নি। বাসনা এমনিতেই গম্ভীর, তবু

তার মনের অতলে যেন অন্য মন এক প্রশ্ন এনেছে। বাসনার ম
হয় কোথায় অনেক শূন্য, রিক্ত।

এই রিক্ততার বেদনাই বাসনাকে যেন মুখর করে তোলে। তবু বাসনা সেটাকে প্রকাশ করতে চায় না। বলে সে।

—এসময় ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ভোরের বেলায় একটা চাদর চাপা দিয়েও তো বসতে পারেন।

হাসল ললিত—না না। শরীর আমার ভালোই আছে।

আর সেটা দেখাবার জন্যই যেন জোর করে আলাপ সুরু করে—তানপুরায় সুর তুলে। বাসনা সরে এল।

লখিয়া দেখেছে এই ব্যাপারটা। সেও সকালে ললিতের সুর না শুনে অবাক হয়েছিল। তাই দিদিমণিকে এসে খবর নিয়ে যেতে দেখে লখিয়া বলে।

—বাবুজী ওইসাই দিদিমণি, কাউকে কুছু ভি জানাবে না। কাল রাতকো দেখলাম হিম-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বাত করছিল গৌরী দিদিমণির সাথ।

বাসনা কথাটা শুনে একটু অবাক হয়। গৌরী যেন তার সেই নোতুন অনুভূতির জগতে একটা কালো ছায়া ফেলেছে। তবু চেপে রেখে বলে বাসনা।

—তোদের ওস্তাদজীকে বলবি এখানে অসুখ বাধালে দেখার কেউ নেই। একটু সাবধানে যেন থাকে।

বাসনা কথাটা বলে দাঁড়ালো না। চলে যায় বাড়ির দিকে।

লখিয়াও আবার গরুগুলোকে জাবনা দেবার আয়োজন করে। তার এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। রামুটাও ভোরে উঠে বাজারে চলে গেছে। আজ হাটবার। তাই কাজের চাপও তার বেশী। এসব কাজ লখিয়াকেই করতে হয় বাড়িতে।

হারান আদক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল হুজুর তার গেষ্ট হাউসে ওঠে নি।

বিনোদ অবশ্য তবু হাল ছাড়ে নি। আজ সকালেই ভবনাথকে নিয়ে চলেছে। কাল রাতে মহানন্দবাবুর ওখানে দেবকণ্ঠ-গৌরী আর ললিত গেয়েছিল। সে খবরটা আগেই পেয়েছে। আরও জোর খবর এনেছে গয়াগতি ভট্টাচার্য নিজে।

...হারানবাবু এবার নোতুন করে শিব প্রতিষ্ঠা করবে, মন্দিরও হয়ে গেছে। মার্বেল পাথর—রঙীন রং-বেরং-এর টালিও বসছে দেওয়ালে। বিজলি বাতি ফিট করা হবে।

গয়াগতি তাই সেবাইত-এর পদের জন্য এখন থেকেই উমেদারি করছে। আর জানে ধূর্ত লোকটা কোন ফুলে কোন দেবতা খুশী হয়। তাই সেদিন জোর খবরটা দিয়েছে বিনোদকে।

গয়াগতি বলে—দেখছি ছোটবাবু। ওই ছোকরা এবার তো গেড়ে বসেছে। দেবকণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে গান গায়, আর ওদিকে ছোকরার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে বড়বাবুর বাড়িতে। জামাই আদরে খাচ্ছে। ঠাকুরের পেসাদ নাকি বাবুর রোচে না।

চমকে ওঠে বিনোদ।

—তাই নাকি! তা'এ হুকুম কার গো ভটচায মশায়?

গয়াগতির শীর্ণ মুখে হাসির কুঞ্চন জাগে। ইতিউতি করে গয়াগতি বলে।

—আজ্ঞে ওই বাসনা দিদিমণি নিজেই এসব করেছে। রোজ ভোর বেলায় নাকি গান শুনতে আসে।

বিনোদ চটে ওঠে। ওই ললিত যেন এখানে গেড়ে বসে তার অক্ষমতাকেই বার বার বড় করে তুলে ধরেছে।

তবু ভেবেছিল বিনোদ, ডি-এম সাহেব এখানেই উঠবেন। আর বিনোদ পরিচিত হবে তার সঙ্গে। কিন্তু তা হয়নি।

তার মূলেও ওই ললিত, দেবকণ্ঠের মেয়ে—আর মহানন্দবাবুই। কাল রাতে ডি-এম সাহেব ওখানেই খেয়েছেন আসরের পর।

খবরটা রাতেই এসে পৌঁছে গেছে। ভবনাথ বসে ছিল। বিষ্টুপদ বলে—গাঁয়ের লোক বলছে, যেন চাঁদের হাট বসেছে ছোটবাবু! গাঁয়ে ওরা ছাড়া কি আর কেউ নেই? আর ভবনাথ কি দেবগ্রামের ওস্তাদ নয়?

বিনোদ কি ভাবছে। ও বলে—দেখছি। এর বিহিত হবে! ভবনাথ কালই গাইতে হবে তোমাকে। ওরা শুনিয়েছে রাতের রাগ রাগিণী, কাল সকালের রাগ রাগিণী গাইবে ডি-এম সাহেবের ওখানে। ব্যাটা ট্যারা হয়ে যাবে। পারবে?

ভবনাথ ইতিমধ্যে দু'এক পাত্র চড়িয়েছে। তাই বেশ রঙীন অবস্থায় বলে।

—আলবৎ পারবো। না হলে আমার নামে কুকুর পুষবে ছোটবাবু! বিনোদ ওইসব মতলব নিয়েই এসেছে সাহেবের কাছে ডাকবাংলোয়। মহানন্দবাবু দেবকণ্ঠবাবুদের চেয়ে তার ওস্তাদ বড় এইটাই দেখাবে।

পথে যেতে যেতে বিনোদ ভাবছে কথাটা।

বিষ্টুপদ জানায়—তাহলে তবলার জন্যে মধুকে বলি?

...সুবিনয়বাবু নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই বিনোদকে ফেরাতে পারেনি। বিষ্টুপদ অবশ্য হাতজোড় করে নিবেদন করে কথাটা।

—সকালের রাগ রাগিণী কিছু শুনুন। এও দেবগ্রামের আদি ঘরের জিনিস।

বিষ্টুপদ বেশ গুছিয়ে মোলায়েমভাবে কথাগুলো বলতে পারে।

ডাকবাংলোর একটা ঘরে বসেছে তারা। ভবনাথ সকালেই বেশ গিলেকরা বাহারী পাঞ্জাবী পায়জামা পরে এসে ফরাসে বসে সুর ধরেছে।

সুবিনয়বাবু ওর আলাপ শুনেই বুঝে নিয়েছেন এর দৌড় কতো দূর। বিনোদ ওদিকে বসে মাথা নাড়ছে।

বিষ্টুপদ মাঝে মাঝে তেহাই দেয়—বাহ্ বাহ্ ওস্তাদ।

ভবনাথ চাঁছাছোলা গলায় তাই গমক তান—সাপট তান করে চলেছে। ওদের থামাবার সাধ্য নেই সুবিনয়বাবুর। মনে হয় ওই বিটকে লোকটা বেদম চীৎকার করেই যাবে। থামবে না।

চোখে মুখে ওদের অনিয়ম আর অত্যাচারের ছাপ। চোখের কোলে কালচে দাগ, আর গত রাতের মদ্যপানের হালকা নেশাটা তখনও যেন রয়েছে।

সুবিনয়বাবু ঘড়ির দিকে চাইছে। কিন্তু এদের তবলা বাজছে তেমনি জোরে, আর ভবনাথও আজ সুযোগ পেয়ে সে যে কত বড় এলেমদার সেটা দেখাবার জন্য মরীয়া হয়ে চীৎকার করে চলেছে।

এদের সমবেত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার পথ খুঁজছেন সুবিনয়বাবু।

হঠাৎ দরজার কাছে বারান্দায় ললিতকে দেখে চাইলেন সুবিনয়বাবু।

—ললিত বাবু যে। আসুন—আসুন।

সুবিনয়বাবু ললিতকে ডাকছেন। ললিত সকালে কি ভেবে বের হয়েছে। কাল সুবিনয়বাবু ওকে দেখা করতে বলেছিলেন। কাজের মানুষ ডি-এম সাহেব। তবু সকালটায় ফাঁকা পাওয়া যাবে তাঁকে—এই ভেবেই এসেছিল ললিত।

কিন্তু ডাকবাংলোর বারান্দায় উঠে ঘরের মধ্যে ওই তুমুল তান কর্তন আর বেধড়ক তবলা পেটা শুনে অবাক হয়েছে ললিত। ভিতরে আসবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সুবিনয় বাবু ওকে ঘরে ডাকছেন।

—আসুন!

ললিতের ফেরারও পথ নেই।

তবু সে বলে—আপনি ব্যস্ত রয়েছেন পরে আসবো।

—আরে ব্যস্ত কি : এদের হয়ে গেছে। ভেতরে আসুন। সুবিনয়-বাবু ওদের থামাবার পথ পেয়ে গেছেন।

বাধ্য হয়ে ললিত ভিতরে এল। ভবনাথ সবে মধ্যলয় থেকে দ্রুতলয়ে আসার চেষ্টা করছে, গমক মেরে, কিন্তু সামনে এ সময় ললিতকে আসতে দেখে ভবনাথ একটু ঘাবড়ে যায়। ছুটতান করতে গিয়ে আর সোম খুঁজে পায়না—আবার একটা হলক্ তান করে ওঠে, আর তবলচীও দুম ধাড়াক্কা তবলা পিঠছিল—সেও সোম খুঁজে না পেয়ে তবলা ছেড়ে দিয়েছে।

বিনোদবাবু বিরক্তি ভরে ধমকে ওঠে তবলচীকে—এ্যাই, ঠিক্‌সে ঠেকা লাগা—সব গোলমাল হয়ে গেল যে।

চোখ খুলেই সামনে ললিতকে দেখে চমকে ওঠে বিনোদ। সকালের খোঁয়াড়ির তখনও আমেজটুকু রয়েছে বিনোদের মেজাজে, হঠাৎ ললিতকে এখানে দেখে চাইল।

ভবনাথও তান্ ছিটকে বেকায়দায় পড়ে থেমে গেছে। গানও শেষ।

বিনোদ হুকুম দেয়।

—চালাও ওস্তাদ। তোড়ির টুকরা লাগাও।

ভবনাথও হিজ মাস্টাস' ভয়েসের মত আবার দম নিয়ে গলার শির ফুলিয়ে আওয়াজ ছাড়ার মুখেই সুবিনয়বাবুর কথায় থামলো।

সুবিনয়বাবু বলেন—অনেকক্ষণ তো শুনলাম। বেশ ভালো লাগলো। এবার আমার একটু কাজ আছে বিনোদবাবু।

বিনোদ ইঙ্গিতটা বুঝেছে। অর্থাৎ তাকে এবার চলে যাবার কথাই বলতে চান ডি-এম সাহেব। আর ওই ললিতই এখানে এ সময় এসেছে ইচ্ছা করে এইটাই বুঝে বিনোদ বলে।

—ঠিক আছে স্যার। চল হে ভবনাথ।

সুবিনয়বাবু এবার ওদের বিদায় করে ঘরে এসে চাইলেন ললিতের

দিকে। ললিতও দেখছে সুবিনয়বাবুকে।

আজ সে এখানের জেলার কর্তা, কিন্তু এই সুবিনয়কে চেনে ললিত।

ললিত ভেবেছিল কলকাতা থেকে সরে এসে সে সব কিছু ভুলে থাকবে, ছিলও। কিন্তু হঠাৎ সুবিনয়ের মুখোমুখি হবে এইভাবে ভাবেনি। সুবিনয়রা ললিতদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত। সুবিনয় ওর বন্ধুস্থানীয়। কলকাতায় এক অঞ্চলেই তাদের বাড়ি। স্কুল কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল। তারপর ললিত এসেছে অন্য পথে—আর সুবিনয় ছাত্র হিসাবে কৃতি তাই সে একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করে আজ জেলার কর্তা হয়ে এখানে এসেছে।

সুবিনয় তবু আগেকার মতই সহজ সুরে বলে।

—কাল রাতেই তোকে দেখে অবাক হয়েছি। এখনও স্বভাব এতটুকু বদলায় নি! তেমনিই রয়ে গেলি?

হাসল ললিত। তার নিজের কাছেই এই যাযাবর মন একটা বিস্ময়ের বস্তু। নিজেই তার কাজগুলোর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পারে না।

আজ বহুদিন পর পুরোনো বন্ধুকে পেয়ে ললিত বলে—কি আর করা যাবে বল।

হাসে সুবিনয়—তোর বাবার সঙ্গে দেখা, তিনি তো অনেক কথাই বললেন। তোর দাদার হাতে কারখানা-অফিস সব ছেড়ে উনি বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে গেছেন।

ললিত কি ভাবছে। জানে সে দাদাদের সঙ্গে মানিয়ে চলা বাবার সম্ভব হবে না। এমনি একটা কিছু ঘটবেই। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা ভাবেনি ললিত। বাবার জন্য চিন্তা হয়।

সুবিনয় বলে।

—কিছু করতে চাস—কলকাতায় বসেই করতে হবে। এখানে

হয়তো সাধনা করা যায় সত্যিই, কিন্তু তার প্রচার প্রসার তো এখানে সম্ভব নয়। রেডিও টি-ভি সিনেমা অনুষ্ঠান এসবতো দরকার ললিত।

ললিতও ভাবছে কথাটা।

বেলা হয়ে গেছে। দেবগ্রামের হাটে লোকজন জমেছে। সব্জী তরকারী আনাজপত্রের জন্য পাইকের-এর দল ঘোরাফেরা করে।

হারান আদকও ব্যস্ত। তার গদিতে লেনদেন চলছে। সহজ স্বাভাবিক গতিতেই চলেছে দেবগ্রামের জীবন যাত্রা।

ললিত ফিরছে তার আস্তানার দিকে। ওর মনে আজ চিন্তার ছায়া নামে। সুবিনয়-এর কাছে এখানে সে ধরা পড়ে যাবে না ভাবেনি। ওর কথাগুলো তখন ললিতের মনে সাড়া জাগায়।

আজ সে যেন কোথায় নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে এনে শান্তি পাবার নামে নিজেকেই বাঞ্চত করেছে। সমাজের বাইরের একটি দায়-দায়িত্বহীন মানুষে পরিণত করেছে।

আর তাই হয়তো সে আপনজন—তার সমাজ সত্যিকার কাজ থেকেই সরে গেছে। চারিদিকে এই গ্রামীণ পরিবেশেও কাজের ধারা বয়ে চলেছে। হাটের কর্ম-মুখর পরিবেশটাকেও দেখেছে ললিত।

মনে হয় জীবনের চলমান স্রোত থেকে সে যেন সরে গিয়ে কোথায় আত্মগোপন করে চলেছে। ছায়া নামে গ্রামের পথে।

ধূলো উড়িয়ে গরুর গাড়ি চলেছে, চাকার আর্তনাদ ওঠে। বাঁশবনের সবুজে একটা পাখী ডেকে চলেছে। কাকে দেখে চাইল।

—আপনি!

দেবকণ্ঠবাবুর বাড়ির মাহিন্দার বলরাম বলে।

—আপনাকে ডাকতে যাইছিলাম আমরা, বাবু খবর দিতে বললেন। তা যেয়ে দেখলাম আপনি নাই। পথে দেখে এলম। বাবু ডাকছেন গো।

ললিত কি ভেবে বলে।

—তুমি যাও, আমি ওর সঙ্গে দেখা করেই ফিরবো।

...দেবকণ্ঠবাবুর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বয়সও হয়েছে। আজ এতকাল ধরে শুধু মন্দ বরাতের ঝড় ঝাপটা খেয়ে খেয়ে কমজোরী হয়ে গেছেন। তবু শেষ বয়সে ললিতকে পেয়ে মনে মনে খুশী হয়েছেন। একটু আশার আলোও দেখেছে লোকটা।

কাল রাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে গান গেয়েছে বহুদিন পর। কেমন ক্লান্তি বোধ হয়। দীর্ঘ তানের ফলে বুকে চাপ ধরে। তবু গেয়েছিল কাল পুরো মেজাজে। বাড়ি ফিরেছিল ঠাণ্ডার মধ্যে। তারপরই সুরু হয়েছে অসুখটা আরো বেশী মাত্রায়।

ললিত ওদের বাড়িতে ঢুকে এগিয়ে যায় দেবকণ্ঠের ঘরে।

—এসো ললিত। দেবকণ্ঠবাবু ক্লান্ত জীর্ণ শরীর নিয়ে বিছানায় উঠে বসে। ললিত দেখছে ওকে। হঠাৎ মনে হয় দেবকণ্ঠ সত্যিই অসুস্থ। মুখেচোখে একটা কালো ছায়া নেমেছে।

ললিত বলে।

—একবার সহরে গেলে হতো না। বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে আসতেন। দরকার বোধ করলে বলুন, আমি ব্যবস্থা করছি। ডি এম সাহেবের গাড়িটাও রয়েছে।

দেবকণ্ঠবাবু হাসলো, মলিন বিষণ্ণ হাসি।

দেবকণ্ঠ বলে—ওর দরকার হবে না ললিত। সতীশ দেখছে, ওষুধপত্রও দিয়েছে। দু'একদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বরং সদরের অনুষ্ঠানের জন্য তৈরী হও। প্রচারেরও দরকার।

দেবকণ্ঠবাবু কাল রাতে ললিতের গান শুনেছিলেন। তখন থেকেই ভেবেছেন কথাটা। তাছাড়া ডি এম সাহেবও বলেছেন অনুষ্ঠানের কথা। তাই এ নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। বাবার এই

ব্যাকুলতার খবর জানে গৌরী। হয়তো ললিতকে বেশী বিশ্বাস করে বাবা।

গৌরী চুপ করে এসে দাঁড়িয়েছে। ললিত আজ অন্য কথা ভাবছে। ও জানে কলকাতায় তার পরিচিতি আছে। সে বলে।

—ওর জন্য ভাববেন না। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, সদরে তো অনুষ্ঠান করবোই। আমরা কলকাতাতেও প্রোগ্রাম করবো। প্রেস-কে ডাকবো সেখানে। রেডিও টি-ভিও আসবে।

দেবকণ্ঠ চাইল ছেলেটির দিকে। মনে হয় মিথ্যা আশ্বাস ও দেয়নি। সে সাধ্য ওর হয়তো আছে। দেবকণ্ঠ এ জীবনে নিজে যা পারেনি, তার যোগ্য শিষ্য তা পারবে। তাই দেবকণ্ঠবাবুর জীর্ণ মুখে আশার আলো জাগে। দেবকণ্ঠবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বলে।

—পারবে ললিত? এই ঘরানার প্রচার প্রসার—এর গান লোকের দরবারে পৌঁছে দিতে পারবে তুমি? সে দিন আমিও দেখে যাবো ললিত।

হাসে ললিত। দেবকণ্ঠবাবুকে বলে সে।

—নিশ্চয়ই দেখবেন।

বৃদ্ধ কি যেন স্বপ্ন দেখছে। ললিতের হাত দুটো ওর হাতে। ললিত বলে।

—আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন। এ সবের ব্যবস্থা আমি করবো। আপনি ভাববেন না।

গৌরী দেখছে ললিতকে। শুনেছে ললিতের কথায় আত্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তা। গৌরীর মনে হয়েছে ললিতের সম্বন্ধে একটা বিচিত্র ধারণা। তার সন্ধানী দৃষ্টিতে ললিত নিজেকে যেন কোথায় লুকোতে পারেনি।

যাত্রার দলের একজন গাইয়েই সে শুধু নয়, তার চেহারা—তার ব্যবহার, মার্জিত রুচি আর শিল্পীমনের সহজ স্বাভাবিকতায় মেশানো

আছে একটা সচেতন সংস্কৃতিবান মন।

আর ওই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেখেছে ললিতের সঙ্গে সম্ভ্রমভাবে কথা বলতে। ললিতও সহজেই যেন তার সঙ্গেও সমকক্ষতার ভাব নিয়েই মিশেছে।

আরও খবর পেয়েছে গৌরী। বাংলোতে বিনোদ দলবল নিয়ে গেছল, ভবনাথও গাইতে বসেছিল। কিন্তু ললিতের সেখানে যাবার পরই ডি-এম গান বন্ধ করে ললিতের সঙ্গেই কথা বলেন। ওরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বের হয়ে আসে।

ললিতের সম্বন্ধে গৌরীর মনেও অনেক প্রশ্ন জেগেছে। হঠাৎ ললিতের আসা, তার মত শিল্পীর এখানে ওই পুরোনো জমিদার বাড়িতে থেকে যাওয়া, ওর ব্যবহার, বাসনাদির ওখানে খাবার ব্যবস্থা, সব মিলিয়ে ললিতকে ঘিরে গৌরীর মনে অনেক রহস্যই জমেছে। আজ ললিত বাবার কথায় অতি সহজভাবে বাবাকে ওইভাবে আশ্বাস দিতে দেখে গৌরীও অবাক হয়।

বের হয়ে এল ললিত দেবকণ্ঠবাবুর ঘর থেকে। সামনে গৌরীকে দেখে চাইল। গৌরী দেখছে ওকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

গৌরী বলে ওঠে—ওসব কথা বললে বাবাকে—উনিও অনেক কিছু আশা করে থাকবেন। এ সব কথা বলে লাভ কি ?

ললিত গৌরীর কথায় একটু অবাক হয়েছে। গৌরী হয়তো তাকে অবিশ্বাস করে, না হলে এভাবে কথা বলতো না। গৌরীর কথায় ললিতের সুপ্ত ব্যক্তিত্বে যেন আঘাত পড়েছে।

সে বলে—নিশ্চয়ই কিছুটা করা সম্ভব গৌরী। বাজে কথা আমি বলিনি। এসব করা যায়, যাবে।

গৌরী এতদিন ধরে ললিতের আসল পরিচয়টুকুই জানতে চেয়েছে, কিন্তু ললিত সঙ্গোপনে নিজেকে যেন সরিয়ে রেখেছে।

আজ গৌরী বলে—ওই ডি এম সাহেবের সঙ্গে তোমার জানা-

শোনা, না ? আর কলকাতার কথা বললে—সেখানেরই লোক তুমি ? বাংলোর চৌকিদার বলেছে সাহেব নাকি তোমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

একটু বিব্রত বোধ করে ললিত, এসব প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বলে।

—ওসব কথা পরে হবে। এখন চলি।

দুপুর হয়ে গেছে। গৌরী বলে—এসময় না খেয়ে বাড়ি থেকে গেছো শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। চাট্টি ডাল ভাত যা হয় খেয়ে যাও। যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে!

কথাটার মধ্যে যেন একটু অন্য সুর ফুটে ওঠে।

ললিত বলে—আপত্তির কি আছে ?

গৌরী শুনেছে বড়বাড়ির বাসনার কথা। সেখানেই খাবার ব্যবস্থা আছে ললিতের। তাই গৌরী বলে—না, অন্য কেউ তো কিছু বলতে পারে।

ললিতও ইঙ্গিতটা বুঝেছে। তবু সহজভাবে বলে—না-না।

বাসনা বাবাকে খাইয়ে দিয়ে তখনও হেঁসেল নিয়ে বসে আছে। নিজের খাবার খেয়াল নেই। ললিত তখনও ফেরেনি, বেলা হয়ে গেছে।

মানদা ঝিও ব্যাপারটা দেখে বলে।

—তুমি খেয়ে নাও দিদি।

বাসনা বলে—লোকটা গেল কোথায় ? এখনও খেতে এল না।

মানদার খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমোনো অভ্যেস। বড় বাড়ির ঝিগিরি করে এই সব অভ্যাসগুলো তার হয়েছে। আর ওই ললিতবাবুকে ডেকে এনে খেতে দেবার ব্যাপারটা সে ভালো চোখে দেখেনি। তবু চুপ করেই ছিল। তাই নিয়ে ঘুমের ব্যাঘাতও হতে সুরু করেছে, তাতে মানদা বিরক্তই হয়েছে। কিন্তু সেই বিরক্তি চেপে রেখে বলে মানদা।

—তোমার এত ভাবনার দরকার কি দিদি। ঠাকুরকে খাবার চাপা দিয়ে রাখতে বলছি। তুমি খেয়ে নাও।

—একবার দেখে আয় না!

বাসনা মানদাকেই পাঠালো আবার।

বাসনার মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল করে চলেছে সে। ললিত বাইরের মানুষ। তাকে কেন্দ্র করে বাসনার মনের অতলের ঝড়টায় সে নিজেও বিব্রত বোধ করে। কিন্তু বাসনার অতল মনে কোথায় একটা বিচিত্র সুর ওঠে।

কাল রাতে সে দেখছিল গৌরীর সঙ্গে ললিতের ঘনিষ্ঠতা। গৌরীকে বাসনা ঠিক মেনে নিতে পারে না। গৌরীর রূপটা যেন জ্বালাকর, আর গান গাইতে পারে সত্যি, কিন্তু তার জন্য ওর অহঙ্কারও কম নেই। আরও কেন জানেনা বাসনা, ললিতকে কেন্দ্র করে তার মনে একটা জ্বালা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মানদাকে ফিরতে দেখে চাইল বাসনা। মানদা বলে।

—বাবু এখুনি ফিরলেন পান চিবুতে চিবুতে। ওই কণ্ঠবাবুর বাড়িতেই গেছলেন, সিখানে গৌরীদিদি নাকি না খেয়ে আসতে দিলে না। তাই বাবু বললেন, খেয়ে এসেছি।

বাসনার মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মানদাও অবশ্য সেটা দেখেছে। তবু না দেখার ভান করে। মানদা বলে।

—যাচলে বাবু খায় না পিঠে, শেষ কালেতে হেঁসেল চাটে। যত্তোসব! যাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও গে, আমি একটু গড়িয়ে নিই। আবার তো এনকার কাজ সুরু হবেক।

মানদা চলে গেল।

বাসনা তখনও চুপ করে বসে আছে। তার সারা মনে একটা আঁধার নামে। ললিত যেন তার কাছ থেকে দূরেই সরে রয়েছে। তার তুলনায় ললিতের মনে গৌরীর ঠাঁই অনেক বড়, না হলে হয়তো

ললিত তার কথাও ভাবতো।

বাসনার খুব খারাপ লাগে। এতবড় বাড়িটায় তার কথা ভাবার কেউ নেই। তার সুখ-দুঃখ চাওয়া-পাওয়ার সব সমাধি ঘটে গেছে এই ধ্বংসপুরীর অতলে। আজ সে একাকী—নিঃসঙ্গ।

খেতেও মন চায় না। খাবারটা ফেলে রেখেই উঠে গেল বাসনা। খিদে বোধটা হারিয়ে গেছে, নীরব মনজোড়া একটা জ্বালার দহনে। বাসনার কাছে এ পরাজয় কি বেদনা এনেছে।

ললিত আজ ভাবনায় পড়েছে। গৌরীর সামনে—দেবকণ্ঠবাবুকে সে কথা দিয়ে এসেছে এবার তাকে কাজ কিছু করতে হবে। তাই প্রথম ধাপ হিসেবে সদরের অনুষ্ঠান-এর সম্মতিই দেবে।

কিন্তু মনে হয় তার পরিচয়টা জানাতেও হবে এখানে থাকতে গেলে। নিজের জালেই যেন জড়িয়ে পড়েছে সে, না হয় আর একটা পথ খোলা আছে। যেমনি অজান্তে এখানে অপরিচিতের মত এসেছিল তেমনি অন্ধকারে অচেনার মতই হারিয়ে যেতে হবে।

দেবগ্রামের ক'মাসের জীবন তার যাযাবর জীবনে কোথায় স্বস্তি এনেছে। তাই এভাবে আবার নিরুদ্দেশের পথে হারিয়ে যাবার কথা ভাবতেও সে দুঃখ বোধ করে।

সন্ধ্যা নামছে।

ললিত দীঘির ধারে এসে বসেছে। মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ওই শব্দটা কি বিচিত্র সুর আনে। যাযাবর ললিতের মনে হয় এই শান্ত জগতে সে যেন তার অস্তিত্ব দিয়ে অমনি একটা আলোড়ন এনেছে। নিজেও জড়িয়ে পড়েছে অদৃশ্য কি বাঁধনে।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল। বাসনা তারার আলোয় দেখেছে ললিতকে এখানে। আরতির পর বাড়ি ফিরছিল বাসনা, দুপুর থেকে মনটা ভালো নেই। হঠাৎ ললিতকে এখানে দেখে দাঁড়ালো।

ললিতও দেখেছে ওকে, তাই উঠে আসে। বাসনা চুপ করে

দেখছে ওকে। দুপুরে খেতে আসতে পারেনি। ললিত তাই জানায়।

—দুপুরে আটকে পড়েছিলাম—আসতে পারি নি।

বাসনা দেখছে ওকে। দুপুর থেকে সে না খেয়েই রয়েছে কি যেন অভিমানে। তাই ললিতের কথায় বাসনা বলে—

দয়া করে খবর পাঠালে বসে থাকতাম না, না খেয়ে। বাড়ির অতিথি না খেলে নিজেদেরও খেতে বাধে। এটাকে মেনে চলি।

বাসনার কথায় ললিত চাইল ওর দিকে।

বাসনার শুকনো মুখ দেখেছে সে, গৌরীর কথা মনে পড়ে। বাসনার নীরবতা গৌরীর সোচ্চার তীক্ষ্ণ কথার ধারে যেন হারিয়ে গেছে। ললিত অবাক হয়। একজন বোধ হয় তার পথ চেয়ে না খেয়েই রয়েছে, আর গৌরীর কথার ভয়ে সে ওখানেই থেকে গেছল।

ললিত বলে—ভুল হয়ে গেছে, দেবকণ্ঠবাবুর বাড়িতে ওরা ছাড়ল না।

বাসনা শোনায়—আমরা আর কি বলুন? নেহাৎ দয়া করে দু'দিন আতিথ্য নিয়েছেন—সেই সুবাদেই চেনা-জানা। আর তো কিছু নেই!

বাসনা কথাটা বলে চলে গেল। ও যেন এড়িয়ে গেল তাকে।

ললিতের মনে বিচিত্র একটা অনুভূতি জাগে। বাসনার ওই কথাগুলোয় তার মনের ক্ষোভ জ্বালাটা ফুটে উঠেছে। হয়তো অভিমানও।

ললিত যেন অনেক বেশী মাত্রায় জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে এখানের মানুষের সঙ্গে। বাসনাও যে এতখানি এগিয়ে আসতে পারবে তা ভাবেনি সে। অবাক হয়েছে ললিত।

বিনোদবাবুও খবরটা পেয়েছে তখুনিই। বাংলোর চৌকিদার

তার বশংবদ লোক, সেই খবরটা এনে দেয়। ললিতকেই ওরা দায়ী করেছে।

বিনোদ, বিষ্টু আর ভবনাথকে নিয়ে তার বৈঠকখানায় ফিরে রাগে অপমানে গর্জে ওঠে। ডি. এম. সাহেব তাদের যেন অপমান করেই বের করে দিয়েছে ডাকবাংলো থেকে।

বিষ্টুপদ বলে—এই ললিতটাই বেড়ে উঠেছে ছোটবাবু, ব্যাটা যেতেই কিনা সাহেবও বদলে গেল। ওই ব্যাটাই চুকলি খেয়েছে। নাহলে ভবা সবে মেজাজ নিয়ে আলাপ সুরু করেছে আর অমনি বলে কিনা আসুন। শ্লা ললিত এতবড় গাইয়ে? ও ভেবেছে দেবগ্রামে মানুষ নাই।

বিনোদ রাগে ফুলছে। এর মধ্যে চৌকিদার খবর আনে, ললিত বাবুরা সব সদরে যাচ্ছে বড় আসরে গাইতে, আর তার চেয়েও বেশী জব্বর খবর আনে শিবু। বিনোদের অন্যতম বাহন। লোকটা অনেক অকাজে কুকাজে থাকে। বিনোদের অবশ্য ওইরকম সাকরেদও দরকার।

শিবু এসে শোনায়—শ্লা ললিতকে দেখলাম দেবকণ্ঠবাবুর বাড়িতে। ব্যাটা যেন জামাই আদর খাচ্ছে ওখানে। তখনই বলেছিলাম ছুটকত্তা, দিই শ্লাকে সমঝে, পালাতে পথ পাবেনা এগাঁ থেকে, তা নয় ব্যাটা জেঁকে বসেছে এখানে। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে?

বিনোদও বুঝেছে গৌরীর ওই কঠিন হবার সাহসটা কোত্থেকে আসছে। গৌরীও মনে মনে যেন ললিতের উপরই দুর্বলতা বোধ করে, আর ললিতও এগিয়ে আসবেই। বিনোদ আদককে কোনরকম পাত্তাই দেয় নি ওরা। বরং বিনোদকে অপমানই করে চলেছে। বিনোদও আর সহ্য করবে না।

এবার একটা পথ নিতেই হবে। ভবনাথও বলে।

—এবার তালে গান ছেড়ে দিয়ে তোমার আড়তে কয়ালীর কাজ

দাও ছোটবাবু, এতদিন রেওয়াজ করে কি পেলাম ? ওই ঘাড়ধাক্কা ?

বিনোদ কিছু বলার আগে বিষ্টুপদ বলে—

—ভাবছি আম্মোও এবার ছোট ভাইপোর কাছে দুর্গাপুরই চলে যাই। সেখানে তবু তবলার মাষ্টারী জুটবে বলেছে। কি আর হবে এখানে পড়ে থেকে।

সব কথাই শুনছে বিনোদ। আজ যেন একা ললিতই নয়, তার বিশ্বস্ত প্রিয় অনুচররাও তাকে অবিশ্বাস করে। বিনোদের কাছে এটা চরম অপমান বলেই বোধ হয়। গৌরীকেও জবাব দিতে পারেনি বিনোদ। আজ মনে হয় একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে। তাই বিনোদ বলে।

—শিবু, বৈকালে আসবি কথা আছে ! জরুরী কথা।

এমনিতে গম্ভীর হয়ে উঠেছে বিনোদ। বিষ্টুও দেখেছে বিনোদকে। এবার মনে হয় সত্যিকাব কাজ কিছু হবে। তাই বিষ্টু বলে ভবনাথকে—চলো ওস্তাদ। পরে কথা হবে।

চলি গো ছোটবাবু।

বিনোদ কথাটা ভেবেছে, আর শেষ সিদ্ধান্তই নিয়েছে।

এবার সেও চুপ করে থাকবে না। দরকার হলে ওই পরগাছা ললিতকে দেবগ্রামের মাটি থেকে সরিয়ে দেবে।

বিনোদ আদকও এবার রেগে উঠেছে। শিবু ওর অনেক দিনের সহচর। গোল চাকামত মুখ—কুতকুতে চোখ দুটোয় কি যেন শয়তানীর ছাপ ফুটে ওঠে।

বিনোদ বলে—আমিও আশপাশেই থাকবো। ও ব্যাটা ওস্তাদ-এর বাচ্চাকে এখান থেকে হটিয়ে দিতে হবে।

শিবুর কাছে এসব অতি তুচ্ছ কথাই।

বিনোদবাবুদের হয়ে এর চেয়ে অনেক বড় কাযই উদ্ধার করেছে সে সেবার মাঠ দখল-এর সময় শিবুর দল লড়েছিলও তেমনি।

হারাণবাবুও খুশী হয়ে ওদের বকশিষ করে। শিবুকে ধানকলে চাকরীও দিয়েছিল।

এখনও শিবু ওদের অন্ধকারের কাযেই রয়ে গেছে। শিবু বলে—এ নিয়ে ভাববেন না ছোটবাবু, ও ব্যাটাতো শিবুর কাছে মশা। ওকে সিধে করে এখান থেকে তাড়িয়ে দেব!

লখিয়া ঘুমোতে যায় অনেক রাত্রে। তখন বাড়িগুলো ঘিরে থমথমে আঁধার নামে, নিস্তব্ধ হয়ে যায় এই অঞ্চল। রাত্রির বেলা এই ধ্বংসপুরীর রূপ বদলে যায়। সামান্য কয়েকটি মানুষের অস্তিত্ব যেন সাময়িকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারাগুলো আকাশে ঝকমক করে। দিঘীর জলে তারই আলোর ঝলক ওঠে। বাতাসে ওঠে দেবদারু গাছের পাতার একটানা সুর।

লখিয়ার তখনও বিশ্রাম নেই।

ওদিকে ওস্তাদের ঘর তখন স্তব্ধ। মরদগুলো দিনভোর খেটে এখানে ওখানে পড়ে ঘুমোয়, লখিয়াকে গোয়াল ঘরটা তদারক করে আসতে হয়। ক'দিন হল একটা গরু বিয়োবার সময় হয়ে গেছে। রাতের বেলায় বাচ্চা হলে বিপদ।

তাই লখিয়াকে সজাগ থাকতে হয়। এদিক-ওদিক সব দেখে শুনে লখিয়া এসে ঘরে ঢোকে।

সব দেখে শুনে আসছে লখিয়া। হঠাৎ দেখে বাজারের শিবু ওস্তাদের ঘরের ওদিকে ঘুর ঘুর করছে। সঙ্গে আরও একজন কে রয়েছে। লখিয়া একটু অবাক হয় শিবুর মত সজ্জন ব্যক্তিকে এত রাত্রে এখানে আসতে দেখে। লখিয়া বাজারের ওই কুত্তাদের চেনে খুব ভালো করে। যত ঝামেলাতেই ওরা থাকে, সব সময় কোন বদ মতলবেই ঘোরে। ওই ওদের কায।

আজ এমনি রাতের অন্ধকারে শিবুকে এখানে দেখে লখিয়া একটু

অবাক হয়। শিবু অবশ্য দেখেনি মেয়েটাকে।

লখিয়া গোয়ালে গরু-বাছুরগুলো বাঁধতে গিয়ে হঠাৎ শিবুকে ওস্তাদের ঘরের এদিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। লোকটাকে সে চেনে—এখানে রামুর কাছেও চোলাই মদ কিনতে এসে দু'চারবার তার ওপর হামলা করার চেষ্টাও করেছিল।

রামুর সঙ্গে সেবার বেশ জোর মারপিট হয়ে যায়। শিবু এখানের অনেক কুকাজের মূলে রয়েছে। আর সেই লোকটা এবার যেন তাদের আস্তানাতেই এসে হানা দেবার মতলব করছে। লখিয়াও এবার ওই লোকটাকে জবাব দেবে।

তাই লখিয়াও একটু অবাক হয়ে ওকে দেখে।

চুপ করে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সে। নজর রাখছে ওর দিকে। লখিয়া অবাক হয়, শিবু এখান থেকে চলে যাচ্ছে—কিন্তু একা নয়। আর একজনও দাঁড়িয়েছিল একটু তফাতে। সেই দু'টো ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে একসঙ্গে।

লখিয়াও সাবধানী পায়ে চলেছে ওদের উপর নজর রেখে। গোয়ালের গরুগুলো ঢোকানো হল না।

কালো বিরাট একটা এঁড়ে বাছুর ওকে দেখে ছাড়া পাবার জন্য দাপাচ্ছে। লখিয়ার ওই এঁড়ে বাচ্চাটা ভয়ানক দুরন্ত, এর আগেও দু'চারটে বিপদ ঘটিয়েছে। তাই সব সময় ওটাকে বেঁধে রাখে লখিয়া।

ছায়ামূর্তি দু'টো দীঘির ঘাটলার দিকে চলেছে।

বিনোদ আর শিবু খুঁজছে ললিতকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে তারা। শিবুই ঝাঁপিয়ে পড়বে রাতের অন্ধকারে ললিতের উপর। আজ রাতেই ওকে এখান থেকে দূর করে দেবে, দরকার হলে তাকে শেষ করে নদীর চরে পুঁতে দেবে। এমন দু'চারটে ঘটনা

শিবু ঘটিয়েছে। তাদের আর কোন খবর কেউ পায়নি। নাম পরিচয়হীন যাযাবর ললিতকেও তারা এখানের মাটি থেকে মুছে দেবে।

···হঠাৎ বিনোদ, শিবু থমকে দাঁড়ালো একটা গাছের ছায়ায়। ঘাটের কাছে দেখা যায় ললিতকে। ওর সঙ্গে বড়বাড়ির বাসনাকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে অবাক হয়।

বিনোদের বিক্ষোভ আর রাগ যেন বেড়ে ওঠে। ললিত ক'মাস এখানে এসেছে, আর বেশ বহাল তবিয়তে যে রাসলীলা করে চলেছে, সেটাই যেন বুঝেছে বিনোদ।

চাপা স্বরে শিবু বলে—চৌধুরী বাড়ির বিধবা ছুঁড়িও যে ব্যাটার পিরিতে টগমগ গো, অন্ধকারে ঘাটলায় জলকেলিও চলবে নাকি গো? না, লটবর মাইরি!

বিনোদ শিবুকে ইশারায় থামতে বলে ওদের দু'একটা কথা শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু এতদূর থেকে ঠিক শোনা যায় না।

বাসনা চলে যেতেই এবার বিনোদের ইশারায় ললিতকে একা দেখে শিবু তৈরী হয়ে এগিয়ে যায় ওর দিকে। এইসব লীলাখেলার জবাব দিতে হবে এবার।

ললিত লোকটাকে চেনে না, গালের উপর থেকে কপাল অবধি কাটা দাগটা শিবুর মুখে এনেছে আদিম হিংস্রতার ছায়া। একরাশ চুল এসে পড়েছে ওর কপালে—চোখদুটো লালচে। তারার আলোয় ওকে দেখে চাইল ললিত।

শিবু বলে ওঠে—বেশ জমিয়ে বসেছো ওস্তাদ। লোকের একটা জোটেনা—তোমার মাইরী আসল আর উপরি দুই, সুদও।

ললিত দেখছে লোকটাকে। বেশ কঠিন স্বরে বলে ওঠে ললিত—কি যা তা বলছেন? কে আপনি?

শিবু খপ্ করে ললিতের জামার কলার ধরে গর্জে ওঠে—তোর

বাপ্‌ বে। বলছি আজ রাতেই এখান থেকে ফুটে যেতে হবে। দেগাঁয়ে বসে লাগর সেজে থাকা আজই খতম করছি।

ললিত ওর শক্ত হাতের থাবায় একটু বিপর্যস্ত বোধ করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে।

লোকটা গর্জাচ্ছে—আবে ফের রোয়াবি? জানসে খতম করে চরের পলিতে পুঁতে দেব না গেলে। চল্‌—বে!

ললিত অতর্কিত ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে। এভাবে কেউ তাকে আক্রমণ করবে তা ভাবতে পারে নি। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, তবু দু'একটা শক্ত হাতে ঘুঁসি এসে পড়েছে। লোকটা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মাঠের দিকে।

...হঠাৎ এমনি সময় কাণ্ডটা বেধে যায়।

বিনোদ দূর থেকে দেখছে শিবুর এলেম। এখান থেকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ওকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে জখম করে ফেলে যাবে। বিনোদ বেশ উপভোগ করছে ব্যাপারটা। ব্যাটা ললিত আর পালাতে পথ পাবে না। এমনি সময় অন্ধকারে হঠাৎ কিসের গর্জন শুনে সচকিত হয়ে ওঠে। জমাট অন্ধকারে কি যেন একটা তেড়ে ফুঁসে আসছে—সরে দাঁড়াবার পথ নেই। একটা অন্ধকার স্তূপের মত এসে সেটা বিনোদকে মাটিছাড়া করে তুলেছে, বিনোদ-এর দু'হাত আসমানে—কোমরে লেগেছে সেই আঘাতটা—আর তারপরই কে যেন তাকে প্রচণ্ড বেগে ছিটকে তুলেছে আকাশে। তারপরই দূরের ভাঙ্গা একটা সান বাঁধানো কঠিন প্রাচীরের উপর তাকে আছড়ে ফেলেছে।

সারা শরীরের হাড় পাঁজর যেন টুকরো হয়ে গেছে—আর্তনাদ করে ওঠে বিনোদ, তারপরই তার জ্ঞানহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ে নীচে কালকাসিন্দের ঘন ঝোপের মধ্যে।

শিবু মালিকের ওই কাতর চীৎকার আর্তনাদ শুনে হাতে মুঠি

থেকে ললিতকে ছেড়ে ফিরে চাইল। কেউ বোধ হয় বিনোদকে আক্রমণ করেছে, শিবুও দৌড়ে এগিয়ে আসে আবছা অন্ধকারে। ওই চীৎকার লক্ষ্য করে।

লখিয়া ওই শিবুকে ললিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে দূর থেকে। আশপাশে লোকজন কেউ নেই যে সাহায্যের জন্য ডাকবে।

রামুও ফেরেনি এখনও। ধূর্ত মেয়েটা বুঝেছে একটা চরম বিপদ ঘটতে চলেছে ললিতের। আর এই হিংস্র লোকটি সব কিছু করতে পারে। কোন পথ না পেয়ে হঠাৎ তার আধক্ষ্যাপা এঁড়ে গরুটার উপর নজর পড়ে। সেটাও টের পেয়েছে মানুষের পায়ের শব্দ, চাপা কথার আওয়াজ। তার শিং সুড় সুড় করছে।

লখিয়া শেষ চেষ্টা হিসেবে এই ষাঁড়টাকে এবার বাঁধন খুলে হাতের পাঁচন দিয়ে কয়েকটা ঘা পিটিয়ে দিতেই সেটা শিং উঠিয়ে লাফ দিয়ে সামনের দিকে ওই আওয়াজ নিশানা করে দৌড়েছে। আর পথের ধারেই দাঁড়িয়েছিল বিনোদ, সামনে তাকে দেখে বিরাট ষাঁড়টা গিয়ে সিধে বিনোদকেই প্রচণ্ড আঘাতে শিং-এর উপর তুলে সপাটে আছড়ে ফেলেছে পাঁচিলের উপর। সে ব্যাটা তখন মরীয়া— মাথা নীচু করে দু' পা ঠুকছে আর শিং দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। ঠিক এমনি সময় এসে পড়েছে শিবু। ঠিক বুঝতে পারেনি সে ব্যাপারটা!

আর ষাঁড়টা এবার সামনে থেকে শিবুর পাঁজরা ঘেঁষে শিং চালিয়ে তাকে দুই শিং-এর ফাঁকে তুলে নিয়ে সতীর দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া শিবের পোজে এগিয়ে চলেছে।

শিবু এমনি বিচিত্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পাঁজরার হাড়টা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে, আর ষাঁড়টার শিং-এ আটকে যাবার ফলে ষাঁড়টাও এবার মুক্ত হবার জন্য ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে গাছের গুঁড়িতে তাকে ঠুকছে।

চীৎকার করছে শিবু প্রাণপণ চীৎকার—বাঁচাও!

ওই বিচিত্র দৃশ্য দেখে ললিতও ঘাবড়ে গেছে।

অন্ধকারে হ্যারিকেন হাতে বাজার থেকে ফিরছিল রামু, সঙ্গে দু' একজন চ্যালা। তারা দৌড়ে আসে। তখন শিবুর সর্বাঙ্গ থেঁৎলে গিয়ে রক্ত পড়ছে আর শিবু সমানে চীৎকার করছে।

—আরে শিবুয়া !...এখানে ?

লখিয়া আঁধার ফুঁড়ে এসেছে। বলে সে—শালা একলা ছিল না। আরও আদমী নিয়ে এসেছিল ওস্তাদজীকে খতম করতে। পুছ কর ওকে ?

এতক্ষণে আরও লোকজন জুটে গেছে।

মহানন্দবাবুও এসেছে। ওরা ষাঁড়টাকে ততক্ষণে কায়দা করেছে শিবু অস্ফুট আর্তনাদ করে।

ললিতও এসে পড়েছে। তার নাকটা রক্তাক্ত, জামাটা ছেঁড়া। লখিয়া গর্জে চলেছে—কাহে এসেছিলি বল্ শ্লা কুত্তা? ওস্তাদজী তোদের কি দোষ করেছিল যে চাক্কু নিয়ে এসে হামলা করলি রাতের আঁধারে। সেই দুসরা আদমী কাঁহা ভাগলো ? বোল বে—

হঠাৎ কে চীৎকার করে ওঠে ভাঙা প্রাচীরের ওদিকে।

এই যে রামু ভাই আর একটা আদমী ভি ইধার !

তাকে তুলে আনতেই অবাক হয় তারা। মহানন্দবাবু ব্যাপারট ঠিক বুঝতে পারে না—তুমি বিনোদ এখানে, একি ব্যাপার ?

লখিয়া বলে চলেছে।

—ও! ছুটবাবু সাকরেদকে নিয়ে এসেছিলো সরকার! তা শ্লা এই ভোলাবাবা দুষমণকে ঠিক সাজা ভি দিয়ে দিলো! ক্যা খাড়া হোতে পারবে, না টেংরি টুটে গেল ? আবে এ শিবুয়া—তখন তো খুব রোয়াব লিছলি ওস্তাদের উপর। খুন করতে গেলি—এখন ? সিধা হো বেটা।

...দু'জনেই আহত, ক্ষত বিক্ষত। দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই।

এমন সময় হারানবাবুর গাড়িটা এসে পড়ে। সতীশ ডাক্তার গ্রামের আরও কিছু লোকজনও এসেছে। হারান আদক বিনোদ আর শিবুকে একসঙ্গে এইভাবে চোট খেতে দেখে গর্জে উঠতে গিয়ে কি ভেবে থেমে গেল।

ব্যাপারটা এখন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। শিবুর কোমরে ভোজালিও রয়েছে, আর লখিয়াও সাক্ষী। অনেকেই জেনেছে যে ললিতবাবুকে ওরা খতম করতে এসেছিল। ওকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল জোর করে। নেহাৎ ষাঁড়টা দড়ি ছিঁড়ে এসে এই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়েছিল, নাহলে ললিতবাবুকে খুন করে গুম করে দিত ওরা।

এ গ্রামের নবীন মাষ্টারকেও চার পাঁচ মাস আগে কারা গুম করে দিয়েছে। আর ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিল এবারও। সেই গুম খুনের কেসের এখনও তদন্ত চলছে। হারান আদক কোন মতে চেপে রেখেছিল এর তদন্তটা।

হঠাৎ আবার আজ এমনি কাণ্ড ঘটাতে গিয়ে বিনোদ যে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে আর দাগী আসামী শিবুটার সঙ্গে এভাবে ধরা পড়বে ঘটনাস্থলে এটা ভাবেনি হারান। সাক্ষী ফরিয়াদী সব মজুদ।

এবার বিপদে পড়ে যাবে বিনোদ, আর জানে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ললিতের বন্ধু। তাই সব ভেবে ঘাবড়ে গেছে হারান আদকও।

এবার সে তাই গাড়ি থেকে নেমে এসে আহত বিনোদের গালেই দুটো চড় কসে গর্জে ওঠে।

—গান শুনতে আসবি তাও চোরের মত লুকিয়ে? ওস্তাদজীর সামনে এসে বসার মুরোদ নেই? গাঁড়োল কোথাকার!

লখিয়া গর্জে ওঠে।

—কোন্ গানা শুনবে বাবুজী? ওই ছুটবাবু আর শিবুয়া?

বাহ-হ! দিন কো রাত, রাত কো দিন বানাতা বাবুজী? ভোজালি হাতে টুটি পাকড়ে ধরে গান শুনতে এসেছিল ছুটবাবু?—ক্যা বে শিবুয়া জবাব দো।

অনেকেই এবার প্রতিবাদ করে। দেবকণ্ঠবাবুও এসে পড়েছে। কে বলে—থানায় খবর দ্যান চৌধুরী কত্তা! আসামীদের থানায় পাঠাতে হবে।

নবীন মাষ্টারের ভাই গোরাশশীও দলবল নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এবার তারাই প্রতিবাদ করে। ব্যাপারটা অন্যদিকে এগিয়ে চলেছে।

দেবকণ্ঠবাবুও সব দেখে শুনে অবাক হন। ললিতের কপালটা কেটে গেছে, নাক থেকে রক্ত পড়ে জামাটা ভেজা, আর চুলগুলো উস্কো-খুস্কো—ওর ওপর দিয়েও ঝড় বয়ে গেছে। দেবকণ্ঠ ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোয়—বেশী চোট লাগেনি তো ললিত?

গোরাশশীও এবার তার দাদার হত্যার শোধ নিতে চায়। মনে হয় ওদেরই কাণ্ড, কারণ নবীন প্রকাশ্য সভায় হারানবাবু বিনোদবাবুদের কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তারাই দারোগাবাবুকে খবর দিতেই দারোগাও ছুটে এসেছে। কারণ হামলাটা হয়েছে ডি-এম সাহেবের খুব পরিচিত একজনের উপর। খবরটা কালই সদরে পৌঁছবে। তাই আগেই সাবধান হতে চায় দারোগাবাবু।

হারান আদক আজ বিপদে পড়েছে। দারোগাবাবু বলেন।

—চিকিৎসা করান কিন্তু থানায় কেস লিখিয়ে যেতে হবে স্যার। আমার করার কিছুই নেই।

মহানন্দ চৌধুরী কি বলতে যায়। গোরাশশীর দল এবার বলে।

—আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না চৌধুরী-কত্তা। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

লখিয়াও বলে—জরুর সরকার, হামি সব দেখেছে—সব বলবো।

...আহত বিনোদ আর শিবুয়াকে তুলে নিয়ে গেল ওরা। তখনও জটলা চলছে।

মহানন্দবাবু বলে—চলো ললিত। ছিঃ ছিঃ এমনি একটা কাণ্ড বাধবে তা ভাবিনি। আজ লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমার আশ্রিত তুমি—এখুনি কিছু হয়ে গেলে কি জবাব দিতাম।

কি ভেবে বলে।

—তুমি বরং ওই বাড়িতেই চল ললিত। ওখানেই থাকবে।

ললিতের সারা মনে একটা গ্লানি জমেছে।

আজ মনে হয় দেবগ্রামের এই শান্তির মাঝে সে দু'দিনের জন্য এসে একটা ঝড়ই তুলেছে। অশান্তির ঝড়। আর কোন বাঁধনে সে জড়াতে চায় না। তাই ললিত বলে—না, না। ওখানেই বেশ আছি। আর কেউ আসবে না গোলমাল বাধাতে।

রামুও জানায়।

—আর কেউ এলে জিন্দা ফিরবে না মালিক। ওস্তাদজীর জিম্মাদারী আমার রইল। কিরে লখিয়া?

লখিয়া রাগে ফুঁসছে। ও দেখছে ভদ্রলোকেদের এই নোংরামি।

লখিয়া বলে ওঠে—জরুর। হাম ভি ভোলেবাবাকে এবার নজদিক বেঁধে রাখবো। কোই আসতে পারবে না।

•

...রাত হয়ে গেছে। ঘুম আসেনি ললিতের। ক'মাস এখানে এসে শান্তিতেই ছিল সে। সুরের সাধনায় মগ্ন হয়ে ছিল। কিন্তু তার জীবনে কোথায় যেন রাহু গ্রহের প্রকোপ রয়ে গেছে, তাই কোথাও শান্তিতে সে থাকতে পারেনি।

কলকাতা থেকে বের হয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। যাযাবরের মত ঘুরেছে যাত্রার দলে, কোথায় লক্ষ্ণৌ—বেনারসে। তবু দেবগ্রামে এসে ভেবেছিল শান্তিতে থাকতে পারবে।

কিন্তু এখানে দেখেছে গৌরী—বাসনার মনের জ্বালাটাকে। তাকে ঘিরে দুটি নারীর মনে এসেছে কি অশান্তির আগুন। আজ আবার নোতুন এক বিপদে জড়িয়ে পড়েছে সে। অন্ধকারে তাকে শেষ করে দেবার জন্য কেউ ছুরি শানাচ্ছে একথা ভাবতেও কষ্ট হয়।

তাই এবার নিজের পথ ঠিক করে নিয়েছে সে। ললিত এখান থেকে চলে যাবে। যাযাবর জীবনে আবার কোন ঠাঁই নিয়ে দু'দিনের ডেরা পাবে—আবার পথের মানুষ পথেই হারিয়ে যাবে।

চলে যেতেই হবে তাকে। ললিত আজ অনেক ভেবেই এই পথই বেছে নিয়েছে। সে না থাকতেও দেবগ্রামের বুকে শান্তির আবেশ ছিল—আবার চলে গেলেও এখানের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে।

গৌরীর মন থেকেও মুছে যাবে সে, বাসনার জীবনে যদি কোন ঝড় তুলে থাকে সেটাও আবার থেমে যাবে।

রাত কত জানে না। এককালে বাবুদের দেউড়ীতে পাহারাদার প্রহর গুণতো, ঘণ্টায় আওয়াজ তুলে। আজ সব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারাগুলো দীঘির জলে দোলা খায়—ঝিকিমিকি তোলে, পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকীগুলো আঁধারে একমুঠো আগুনের ফুলকির মত উড়ে উড়ে ফেরে। আদিম অন্ধকারে হিম হাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ললিত।

গৌরীও কথাটা শুনে অবাক হয়। দেবকণ্ঠবাবু বলে।

—ওকে বোধ হয় খুনই করতে চেয়েছিল ওই বিনোদের দল।

দেবকণ্ঠ বাবু ওখান থেকে ফিরে এসে খবরটা শোনায় বাড়িতে, গৌরী অবাক হয়।

—তাই নাকি? কি ওর দোষ যে বিনোদবাবু শেষ করবে ললিতদাকে?

হাসে দেবকণ্ঠ। বলে—দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। ভালো

গায়, তাই হয়তো হিংসায়। যা রাত হয়েছে শুয়ে পড়।

গৌরী ভাবছে কথাটা। বিনোদকে চেনে সে। আর বিনোদকে কঠিনভাবে অপমান করেছে গৌরী। তাই তারই শোধ নেবার জন্য যেন ওরা হামলা করেছিল ললিতের উপর।

ওই নিরাশ্রয় ছেলেটিকে আজ গৌরী যেন নোতুন করে চেনে। কোনদিন সে মুখ ফুটে কিছু বলেনি। গৌরীই তাকে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে। কথার ফুল ফুটিয়েছে বারবার। তার ব্যবহারে ফুটে উঠেছিল শুধু অবজ্ঞাই।

ললিত সব কিছুকে মেনে নিয়েছে মুখ বুজে। আজ তার জন্যই ললিতের উপর ওই বিনোদ আক্রমণ করেছিল। গৌরীর ঘুম আসে না। বারবার অসহায় বেদনাতুর একটা মুখ—তার নীরব চাহনিই ভেসে ওঠে গৌরীর চোখের সামনে।

ভোর বেলাতেই গৌরী চলেছে।

সকাল বেলায় গৌরীকে এখানে দেখে চাইল ললিত।

—তুমি!

গৌরী দেখছে ললিতকে। কপালটা কেটে গেছে। তখনও ফুলে রয়েছে চোখের কোল। চোখ মুখ থমথমে। তানপুরাটা ওদিকে রাখা—আজ ললিতের রেওয়াজ করার মত মানসিক অবস্থাও নেই। বেদনাহত চাহনি মেলে দেখছে সে গৌরীকে। গৌরীর বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে কি বেদনায়।

—কেমন আ ে

গৌরী শুধোয়। ওর কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে।

ললিত বলে—ভালোই! অবশ্য কাল ওরা থাকার সমস্যাটা মিটিয়ে দিতো।

গৌরী ওর দিকে চাইল। গৌরী অপরাধীর মত বলে।

—কেন ওদের এত রাগ তোমার উপর তা বুঝি।

ললিত বলে—ভাবছি এখানের জীবনে শুধু অশান্তি সৃষ্টি না করে এবার চলেই যাবো। তবু এখানে শান্তি নামুক। অনেকের কাছে অশান্তি এনেছি—একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

গৌরী বলে ওঠে—প্রশ্ন তো তুমিই! আজও তোমার কোন পরিচয়ও জানাওনি।

হাসে ললিত—আমি শিল্পী। শিল্পীর জাত নেই। আর জাত পরিচয় দিয়ে নিজের জন্য কিছু পেতেও চাইনি কোনদিন। ওজন্য কোন মোহ আমার নেই।

গৌরী দেখছে ললিতকে।

গৌরীর মনে হয়, বারবারই এড়িয়ে গেছে ললিত এই প্রশ্নটা কি অভিমানে। ললিত বলে।

—আমার আসাও আকস্মিক, চলে যাওয়াও হবে তেমনি। হয়তো তাতে ভালো হবে অনেকেরই।

গৌরী জবাব দিল না। ললিত যেন কি অভিমানে নিজেকে সব পাওয়া থেকে নির্বাসিত করে রাখতে চায়। এর কারণ কিছু জানে না গৌরী।

বাসনা কাল রাত্রির ঘটনাটা উপরেব বারান্দা থেকে দেখেছিল। ....আবছা আলোয় দেখেছিল ললিতের রক্তাক্ত মুখখানা। আর ওই ছুটো মানুষেব নাম সে জানে।

দেবগ্রামেব কুখ্যাত মানুষগুলো কার উপর আক্রমণ করেছিল। বাসনাকেও দেখেছে তারা। কথাটা ভাবতেও চমকে ওঠে বাসনা। আজ মনে হয় সেও যেন দেবগ্রামের অন্ধকারের জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে কোথায় জড়িয়ে গেছে তার নিজের ভুলে। কাল ওই ঘাটলার ধারে ললিতের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটাই তার ভুল হয়েছিল। হয়তো ওই বিনোদ শিবুরাও দেখেছে তাকে। আর খবরটা ছড়িয়ে

পড়লে এই বড় বাড়ির মান সম্মানও ধূলোয় মিশিয়ে যাবে।

বাসনা চমকে উঠেছে। মনে হয় একটা ভুলই করেছে সে এতদিন মনের দুর্বলতাটাকে আজ চিনেছে, আর বাসনা মনকেও তাই কঠিন করে তুলতে চায়।

এই বড়বাড়ির কোন গুপ্তধনের সন্ধানী সে। সেই অন্ধকার অতলে কোথায় কি সম্পদ আছে সে জানে না। কিন্তু একটা সম্পদের জিম্মাদারী তার হাতে রয়েছে তা বুঝেছে বাসনা, সেটা হচ্ছে এই বড়-বাড়ির মান সম্মান।

তাই সব দিক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সেই সম্পদকেই যক্ষের মত আগলাতে হবে। যক্ষ যাকে অন্ধকার অতলের ধনাগারে বন্দী করে, তার জাগা আত্মার কোন কামনা বাসনা নেই—শুধুমাত্র তন্দ্রাহীন তমসায় লুপ্ত দিবারাত্রির প্রতিটি প্রহরে সে সজাগ থাকে সেই সম্পদের প্রহরায়।

আজ বাসনার দু'চোখ দিয়ে জল নামে। নিজের সব কিছু যেন হারিয়ে গেল।

মানদা বলে।

—কাল থেকে খাওনি দিদি। চানটান করে মুখে জল দাও।

বাসনা ক্লান্ত স্বরে বলে।

—বিষ দিতে পারিস মানদা? আমার বেঁচে থেকে লাভ কি বল? এভাবে বাঁচার কোন দাম নেই রে। সব কিছু বিষিয়ে গেছে আমার।

সকাল বেলার আলোও ওই বাসনার মুখের অন্ধকারকে মুছে দিতে পারেনি। বাসনাও বুঝেছে সেটা।

মানদা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বাসনার দিকে। অনেক দিন পর দিদিমণির মুখে আবার ওই কথা শুনছে সে।

মানদা ওসব প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে।

—নোতুনবাবুর জন্য কি রান্না হবে দিদি? বড় বাবুতো মাছে

পাতলা ঝোল খাবেন। নোতুনবাবুর জন্য কালিয়া—

বাসনার আজ যেন ওসব ভালো লাগে না। বাসনা বলে।

—যা বুঝিস কর গে। আঁশ হেঁসেলে আমি যাবো না।

মানদা অবাক হয় দিদিমণির কথায়। এতদিন পর হঠাৎ যেন মেয়েটা কঠিন হয়ে উঠেছে। মানদা জবাব দিল না।

দুপুরে খেতে বসেছে ললিত। আজ তারও বিচিত্র ঠেকে। অন্যদিন বাসনা নিজে থেকে পরিবেশন করে, দাঁড়িয়ে থাকে। আজ বাসনা একবারও আসেনি। তাকে খেতে দিয়েছে ঠাকুর।

আর মানদা বলে—দিদিমণির কি পূজোর উপোস আছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত। আপনি খেয়ে নিন! তা ভাত আর দিই ?

ললিত দেখেছে বড় বাড়ির অন্তরালের মেয়েটির খেয়াল। একটু আগে ওকে দেখেছিল বারান্দায়। ললিতকে দেখে যেন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে। ললিতের কাছে মনে হয় এ যেন অনুকম্পা নিয়ে টিকে থাকার মতই। তার নিজের স্বার্থ নিয়ে এবাড়িতে সে আসেনি, এগিয়ে এসেছিল বাসনাই। সেটাও পছন্দ করেনি ললিত। তাই আজ বাসনা শুধু তাকে এড়িয়েই যায়নি অপমানই করেছে। ওই অন্ন যেন গ্রহণ করতে তার বাধে।

কোনরকমে কিছু খেয়ে উঠে পড়ে ললিত। মানদা অবাক হয়।

—ওইটুকু মাত্তর খেলেন ?

ললিতের কপালটায় ব্যাণ্ডেজ, তখনও বেদনা রয়েছে। শরীরটাও ভালো নেই। ললিত বলে।

—অনেক খেয়েছি। আজ রাত্রে খেতে আসতে পারবো না। বাইরে একটু কাজ আছে।

কথাটা জানিয়ে বের হয়ে এল ললিত। ঘরের ওদিকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। এক নজরে দেখেছে সেও ললিতকে।

কপালে ব্যাণ্ডেজ, মুখটা যেন ফুলে রয়েছে, ছ'চোখের চাহনিতে নীরব বিষণ্ণতা ফুটে ওঠে।

বাসনার বুকের ভিতর নীরব যন্ত্রণাটা মোচড় দিয়ে ওঠে, তবু সে আজ নিজেকে যেন বন্দী করে রেখেছে।

ললিত চলে গেল—তখনও দাঁড়িয়ে আছে বাসনা! হঠাৎ পেছন ফিরে আলমারীর গায়ে বসানো বড় আয়নাটায় নিজের প্রতিমূর্তিটা দেখে চমকে ওঠে। শাদা শাড়িপরা নিরাভরণ মূর্তি, শূন্য সিঁথিতে কি বেদনার্ত রিক্ততা নিয়ে সে জীবনের আলোকবৃত্ত থেকে চির নির্বাসিতা একটি সত্বা। কি হাহাকারে গুমরে ওঠে সারা মন, এই বড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপের অতলে যেন একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠছে।

বাসনার ছ'চোখ বেয়ে জল নামে।

...কালিদাসবাবু বিরাট বাড়ি কারখানার সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে বুড়ো চাকর দাশরথিকে নিয়ে লেকের ধারের বাড়িটায় আশ্রয় নিয়েছে। আজ এই শান্তিময় পরিবেশে হারানো ছেলেটার জন্য মন কেমন করে। ললিতের কোন খবরই পায়নি অনেক দিন। যাত্রার দলের অপিসেও গেছে, কিন্তু তারাও কিছু বলতে পারে না। ম্যানেজার বলে।

—আমাদের পথে বসিয়ে মাঝপথে দল থেকে কেটে পড়লো, মশায়। এ্যামন আর্টিস্ট-এর মুখে মারি ঝাঁটা।

কালিদাসবাবু তবু অপমানটা সয়ে শুধোন—কোথায় সে দল ছেড়ে গেল? কোন জায়গায়?

কলকাতার গদিঘরের ম্যানেজার বলে।

—অত সব আমি জানবো ক্যামন করে বাবু। দল পরিচালকও এ-দল ছেড়ে গেছে এখন। ওসব খপর কে দেবে?

কালিদাসবাবু হতাশ হয়েই ফিরে আসেন।

দাশরথি বলে—মন খারাপ করে কি করবেন বড়বাবু। ঘরে যে থাকবে না তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি ?

হয়তো ওর কথাই সত্যি। তাই চুপ করে থাকে কালিদাসবাবু। এতো বড় পৃথিবীতে যেন ছেলেটা শুধু পথে পথেই ঘুরে চলেছে। কোথাও তার জন্য কোন আশ্রয় নেই।

একাই এ বেদনাটাকে বয়ে বেড়ান কালিদাসবাবু। বৈকালে লেকের জলে কালো ছায়া নামে। পাখীরা ঘরে ফেরে কিন্তু ললিত ফেরেনি আর।

হঠাৎ সুবিনয়কে আসতে দেখে অবাক হয় কালিদাসবাবু। সকালে বাগানে বসে আছে। একটা টাক্সি থেকে এসে নামল সুবিনয়। চেহারাটা বেশ সুন্দর হয়েছে, দামী প্যাণ্ট সার্ট পরণে। ললিতেরই ছেলেবেলার বন্ধু। আজ ওকে দেখে ললিতের কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধের দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

—এসো সুবিনয়। এখন যেন শুনছিলাম ভালো চাকরী করছো ?

সুবিনয় প্রণাম করে বৃদ্ধকে। ওর কথার জবাবে জানায়।

—একটা জেলার চার্জে রয়েছি এখন।

বৃদ্ধের উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। তবু বলে সে—সুখে থাকো বাবা।

সুবিনয় শুধোয়—ললিতের খবর কিছু জানেন ?

বৃদ্ধ মাথা নাড়ে হতাশভাবে।

—না। আজ তারই পথ চেয়ে আছি সুবিনয়। টাকার অভাব নেই—এখানে এসে থাকুক। গান বাজনাতেও বাধা দেব না। আজ তো গানও জাতীয় সম্মান পাচ্ছে। তবে কেন সে এড়িয়ে থাকে বলতে পারো আমায় ? অতীতের ভুল—সেগুলো কি ভোলা যায় না ?

সুবিনয় দেখছে বৃদ্ধকে। সে জানায়—তার সন্ধান আমি পেয়েছি।

—পেয়েছো বাবা ? কোথায় ? ভালো আছে তো ?

কালিদাসবাবুর মুখে জাগে কি আশার দীপ্তি। সুবিনয় জানায়।

—আপনি এত উত্তেজিত হবেন না। সে ভালো আছে। আমিই তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো।

কালিদাস বাবু আজ ভাবছেন ছেলের কথা।

সুবিনয় বলে—সত্যি বড় শিল্পী ও। আমাদের দরকারেই ওকে কলকাতায় আনতে হবে। কথাটা বলেছিলাম ওকে।

কালিদাসবাবু আগ্রহ নিয়ে শুধান।

—কি জবাব দিল সে? আসবে?

সুবিনয়ও ভাবছে কথাটা। বলে সে।

—কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চাইল কথাটা! অলকাদের খবর নিল সব, বলে—দেখি যদি তেমন বোধ করি যাবো কলকাতায়।

দাশরথি বলে।

—তেমন বোধটা কবে হবে তা বলেনি?

হাসলো সুবিনয়। কালিদাসবাবু বলেন।

—আমাকেই যেতে হবে সুবিনয় ওর কাছে। তাই চল দাশরথি, আমরাই একবার ঘুরে আসি।

দাশরথি বলে—চলেন!

সুবিনয় খুশী হয়। ও দেখেছে ললিত যেন কেমন এড়িয়ে যেতে চায় এই জীবন থেকে, এটা ওরও ভালোলাগেনি! ওকে আসা দরকার। সুবিনয় বলে।

—তাহলে আজ রাইটার্স-এ মিটিং সেরে রাত্রি বেলায় বের হবো খাওয়া-দাওয়ার পর, কাল ভোরে আমার ওখানে পৌঁছে একটু রেষ্ট নিয়ে সোজা গাড়িতেই চলে যাবো। বেলা আটটা নাগাদ পৌঁছে যাবো।

কালিদাসবাবু বলেন—তাই চলো বাবা। ওকে সব কথা আমাকেই গিয়ে বলতে হবে!

কথাটা ভেবেছে ললিতও।

কলকাতার কথাও মনে পড়ে। সুবিনয়ও তাকে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা বলেছিল, কোনরকমে এড়িয়ে গেছে ললিত। মনে হয় এতদিন তার এই অজ্ঞাতবাসের কথা অজানাই ছিল। এরা কেউ তাকে চিনতো না। জানতো না।

এবার আর এখানে থাকাও বোধ হয় যাবে না।

হয়তো তার এখানে থাকার খবরটা কলকাতাতেও পৌছে যাবে। আর বাবাকে সে চেনে। তিনি হয়তো এসে পড়বেন!

এভাবে নিজেকে ধরা দিতে চায় না সে। এখান থেকে অপরিচিতের মতই সরে যাবে। হারিয়ে যাবে সে।

জীবনের দাবীটা কোনদিন পূর্ণ করতে পারেনি সে। এ জীবনের চাওয়া অনেক—সে চাওয়ার যেন শেষ নেই।

আর এটাকে কোনদিনই মূল্য দেয়নি সে।

তাই গৌরীর ওই উচ্ছলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেনি। তার ডাগর চোখের কি আমন্ত্রণ! একটি সবুজ স্নিগ্ধতার মাঝে কিছু পাওয়ার তৃপ্তিকে সে কোনদিন মূল্য দেয়নি।

দেবকণ্ঠবাবুর কাছে সে কৃতজ্ঞ, তার মনের ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করতেই হবে। কিন্তু পথ ঠিক যেন পায়নি সে। বাইরে সে প্রচার চায়নি, গানকে পশরাও করতে চায়নি। নিজের তৃপ্তি—তার পথ চলার পাথেয় হিসেবেই নিতে চেয়েছে এই সঙ্গীতকে।

আজ তাই ওর প্রচারের ব্যাপারে কেমন নিরাসক্তি জন্মেছে। নিজের অন্তরের এই যাযাবর চিত্তটিকে সে চেনে নি, কিন্তু নির্জনে সব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে সেই যাযাবর মনটার দাবীই বড় হয়ে ওঠে। এখানে কোন যুক্তি যেন তার স্বপক্ষে দিতে সে পারে না।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

শান্ত সমাহিত তরুবীথি—দেওদার পাম গাছগুলো অতীতের হারানো শ্রী, সমৃদ্ধির স্মৃতিটুকু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সবই হারিয়ে যায় এমনি করে মহাকালের বুকে।

তবু গৌরীরা বেঁচে থাকে জীবনের স্নিগ্ধতার আহ্বান নিয়ে, স্বপ্ন দেখা মন—স্বপ্নজাল রচনা করে। গৌরীরা ভালোবাসে—বড়বাড়ির বাসনাকে দেখেছে। তার কামনার উগ্রতা নেই। কিন্তু নীরব ব্যর্থতার বেদনার অন্তরালে চিরন্তন নারীমনকে নিঃশেষে হারাতে পারেনি ওরা। ভালোবাসার অধিকার সমাজ তার কেড়ে নিয়েছে। তবু মাটির বুকে ফুল ফোটার মতই মনের অতলে প্রেম জেগে ওঠে, ব্যর্থতার উত্তাপে ঝরে যায়।

দেখেছে মহানন্দবাবুকে, দেবকণ্ঠ মহানন্দ ওই বড়বাড়ির মতই। একদিন সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু আজ এমনি আগত অন্ধকারের বুকে ওরা হারিয়ে যাবে। ওদের দিন ফুরিয়েছে।

জেগে উঠবে এখানের গ্রামীণ সমাজে হারাণ আদক, বিনোদের দল। তাদেরই প্রতিপত্তি থাকবে এখানে। অন্ধকারে লখিয়ারা ব্যর্থ হবে তাদের সৎ মনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

সুর ও আলাপের বিবর্ণ বেদনা ব্যর্থ হয়ে ক্ষাপে ক্ষাপে গুমরে ফিরবে এই ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বে। ললিত তাদেরই একজন।

—ওস্তাদজী!

চাইল ললিত লখিয়ার ডাকে। মেয়েটাই তার আশ্রয়দাত্রী। শুধু তাই নয় সেই রাত্রে ওই তাকে বাঁচিয়েছে।

ললিতের চিন্তায় ছেদ পড়ে। শুধোয় সে।

—কি রে?

লখিয়া বলে—তবিয়ৎ ঠিক নেই নাকি? কুছু খাবেন না?

হাসে ললিত। পথের জীবনে সে অনেককে দেখেছে। অনেকের কাছে সে ঋণী।

ললিত বলে—পরে কিছু খেয়ে নেব।

লখিয়াও দেখেছে ওস্তাদজীকে। কথাটা ভেবেছে সেও। কেমন বিচিত্র ঠেকে।

চলে গেল লখিয়া। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় সে।

ললিত চুপ করে বসে আছে।

গৌরী এসেছে, ঘরে না দেখে ললিতকে খুঁজছে সে। লখিয়াকে দেখে শুধোয়—তোদের ওস্তাদ কোথায় রে?

লখিয়া এগিয়ে আসে। বলে সে—ওদিকে চুপসে বসে আছে। গৌরী এগিয়ে যায়, লখিয়ার ডাকে থামল: লখিয়া মেয়ে হয়ে বুঝেছে কোথায় যেন একটা বেদনাই রয়ে গেছে ওই পথহারা মানুষটার জীবনে। বলে লখিয়া—দিদি, তুমি কি? ওস্তাদজীকে এমনি করেই দূরে হটিয়ে রাখবে? তুমি কি মেয়েছেলে নও, আর কি কিছুই চাওনা? পথের মানুষটা বেঠিকানা হয়ে ফিরবে এইসা?

গৌরী অন্য সময় হলে ধমকে উঠতো মেয়েটাকে! আজ পারেনা। কথাটা গৌরীও ভেবেছে। নিজেকে এতদিন চেনেনি। কিন্তু হঠাৎ চিনেছে তার মনের অতলের অন্য মনকে। যে পেতে চায় অনেক কিছু।

কিন্তু বার বার এড়িয়ে গেছে তাকে। ওই ললিতই নিজের চারিদিকে রহস্যের জাল বুনে অচেনাই থেকে গেছে। আজ গৌরীর মনে হয় সেইই হেরে গেছে বার বার ওই মানুষটির কাছে।

এগিয়ে চলেছে গৌরী।

আজ ললিতের রেওয়াজের সুর ওঠে না। রাতের বাতাস-এর হাহাকার ওঠে। তারার মৃদু আলোয় দেখা যায় ওকে। ললিত ওর দিকে চাইল।

গৌরী বলে ওঠে—এখানে বসে আছো?

—এমনিই। ভালো লাগছে না।

গৌরী দেখছে ওকে। ললিতের মুখে কি ভাবনার রেখা।

গৌরী বলে—নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেশী দিন থাকা যায় না। একদিন ক্লান্ত হয়ে সে ওই খেলা শেষ করে পথে পথে ঘোরাও থামায়।

চাইল ওর দিকে ললিত।

—কি বলছো তুমি গৌরী?

গৌরী বলে—এ খেলার শেষ হোক ললিত!

ললিত চমকে ওঠে। গৌরী আজ নিজেকে প্রকাশ করে হাল্‌কা হতে চায়। বলে ওঠে গৌরী।

—তুমি কে? কি তোমার পরিচয় তা দাও নি। সে পরিচয় অজানাই থাক ললিত। কিন্তু শিল্পী হিসাবে, মানুষ হিসাবে যেটুকু দেখেছি তাই নিয়েই তোমার উপর ভরসা করে এগিয়ে আসতে চাই ললিত।

ললিত চমকে ওঠে।

গৌরীর হাতখানা ওর হাতে। কাঁপছে ওর হাতটা। ললিত ওই স্পর্শে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

—গৌরী!

গৌরীর ডাগর ছ'চোখে কি বেদনার অশ্রু। এতদিনের সঞ্চিত ব্যর্থতা যেন চোখের জলে ঝরে পড়ে। ললিত ওকে কি যেন সান্ত্বনার আশ্বাসভরা সুরে ডাকছে—গৌরী!

···তারার আলোভরা রাতে আর একজনও ওই পাষাণপুরী থেকে বের হয়েছিল কি বেদনা নিয়ে। মন্দিরের আরতির পর বাসনা ফিরছে বাড়ির দিকে।

ওদিকে ললিতের ঘরে তখনও অন্ধকার ছড়ানো। বাসনা হঠাৎ ঘাটের চাতালে কাদের দেখে চমকে ওঠে।

গৌরী আর ললিত। ওদের এখানে দেখবে ভাবেনি। ওদের

কথাগুলোও শুনেছে। বাসনার ওই জীবনের কোন আশ্বাস নেই তবু যেন খুশি হয়েছে সে। ওরা সুখী হোক।

বাসনা ফিরছে বড়বাড়ির বন্দীশালায়। সেখানেই তার দিন কাটাতে হবে এই তমসার অতলে।

…ললিত অবাক হয়েছে!

একই ছন্দ, একই জীবন যেন বার বার বিধৃত হয় একই পথে কিন্তু ছন্দপতন নিয়েই তার জীবন। সে ভাবেনি গৌরীর এই দুর্বলতার কথা।

জীবনের এই আশ্বাস যেন তার কাছে মরীচিকার মতই হারিয়ে যায়—আরও তৃষ্ণার্ত হয়ে সে ঘোরে ঊষর মরুরাজ্যে, সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি সন্ধানে।

এই আহ্বান তার কাছে যেন অর্থহীন ব্যর্থতায় ভরা। ললিত মনস্থির করে ফেলেছে। তার জীবনের সঙ্গে কাউকেই জড়াতে চায়না সে। ঘরের বাঁধন তার কাছে নেই—সে চির অতিথি। দু'দিনের জন্য আসে আবার হারিয়ে যায়। ঘরে থাকার আশ্বাস তার জন্য নেই।

রাত্রি নেমেছে। অন্ধকার-এর রাজ্যে স্তব্ধতা জমাট বেঁধেছে। ঊর্ধাকাশে তারার ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হয়ে আসে কুয়াসার ফিকে আবরণে। দেবগ্রামের শান্ত পরিবেশে এমনি রাত্রির অনেক প্রহর ললিতের বেহাগের সুরে ভরে উঠেছে।

আজ সেখানে জাগে যোগিয়ার শূন্যতা। বড় বাড়িগুলোর বুকে যেন গুমরে ওঠে রাতের বাতাসের হাহাকারে একটা বিরহের শূন্যতার সুর। অনেক যুগের বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে এই হাহাকারে।

সকালের প্রথম আলোর আভাস জাগে দীঘির ধারে! সারবন্দী পাম দেওদার গাছের পাতা কাঁপে হিমেল হাওয়ায়। পদ্ম বনে ভ্রমরের গুঞ্জরণ জাগে—ফুলের গন্ধে বাতাস আমন্থর!

বাসনা বাগানে ফুল তুলতে আসে—কিন্তু আজ সুরটা ওঠে না। কতো ভোর কত হিমঝরা সকালের বাতাসে মিশেছে ললিতের আলাপ—বড়বাড়ির গুমরে ওঠা হাহাকার ছাপিয়ে উঠতো তার সুর। আজ সেখানে জেগে আছে আগেকার সেই বুক চাপা হাহাকার আর শূন্যতা।

বাসনা অবাক হয়। কাল রাত্রেও ললিত বড় বাড়িতে খেতে যায় নি। কে জানে শরীর খারাপ বোধ হয়। বাসনার মনে হয় একবার নিজেই এগিয়ে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসবে। কিন্তু থমকে দাঁড়ালো। বড়বাড়ির সেই গুপ্তধনের যক্ষ সে, তার কোন কামনা-বাসনা-স্বপ্ন নেই!

সে চির অন্ধকারে নির্বাসিতা।

পায়ে পায়ে ফিরে এল বাসনা। ধ্বংসপুরীর স্তব্ধতা আর বাধা প্রাচীরের বেড়া ভেঙে দিনের আলো আসতে দেরী হয় অনেক। তাই এখানকার মানুষগুলোর ঘুম ভাঙে দেরীতে।

বাসনা এসে ঢুকলো বড়বাড়ির বন্দীশালায়।

বেলা হয়ে গেছে। একটা গাড়ির শব্দে লখিয়া চাইল। মহানন্দবাবু সকালে দীঘির ধারে বেড়াতে বের হয়। আজও বেড়িয়ে ফিরছে। হঠাৎ গাড়িটাকে এগিয়ে এসে ওই ললিতের জীর্ণ ঘরের ওদিকে থামতে দেখে চাইল। এগিয়ে আসে মহানন্দ চৌধুরী।

লখিয়া গাড়ি থেকে সেদিনের ডি এম সাহেবকে নামতে দেখে হকচকিয়ে গিয়ে রামুকে চারপাই থেকে ঠেলে তোলে—আরে জলদি উঠ। দেখ্ উঠে কৌন আয়া!

—বড় সাহাব !

রামুও ঠেলার চোটে ধড়মড় করে উঠে ওদিকে বড় গাড়ি থেকে সাহেব আরও দু'জনকে নামতে দেখে কোন মতে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়ালো।

সুবিনয় বলে—ওস্তাদজী কোথায় ?

কালিদাসবাবুও গাড়িতে এসেছে সুবিনয়কে নিয়ে। যেভাবে হোক ললিতকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে আজ। সে ওই জরাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই জমাদার—চৌকিদারদের পরিত্যক্ত ঘরে এভাবে থাকতে দেখে অবাক হয়। ললিত এই ভাবে থাকতে পারে সেটা ভাবতেও কষ্ট হয়।

রামু ডাকতে থাকে—ওস্তাদ ! ওস্তাদজী—

অন্যদিন ভোরে ওঠে ললিত। তার সুরে ভরে থাকে জায়গাটা। আজ স্তব্ধতা নেমেছে। ওর ডাকেও কোন সাড়া মেলে না।

রামু উঠে গিয়ে দরজাটা ধাক্কা মারতেই খোলা দরজাটা খুলে যায়। ঘরের চারপাইটা শূন্য, ললিত নেই।

অবাক হয় রামু—কোথায় গেল সে ?

কালিদাসবাবু অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে—ললিত !

কোন উত্তর মেলেনি ওই আহ্বানের।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দেবগ্রামে। মহানন্দ চৌধুরীও এসে পড়ে।

দেবকণ্ঠবাবুও এসেছে। ললিতের কোন খবর নেই। জামা কাপড়ের ব্যাগটা ছাড়া তানপুরা যন্ত্রপাতি সবই পড়ে আছে। যে-ভাবে এসেছিল দেবগ্রামে—ঠিক তেমনি শূন্য হাতেই আবার ফেরার হয়ে গেছে সেই যাযাবর মানুষটা।

গৌরীর দু'চোখ জলে ভিজে আসে। আজ সে পরিচয় পেয়েছে ললিতের। ললিত কলকাতার বিরাট ব্যবসাদারের ছেলে—

কলকাতাতেও তাদের বিরাট কারবার। কিন্তু ললিত ওসব সম্পদ হেলায় তুচ্ছ করে জীবনের কি এক পরম আনন্দের সন্ধানে মত্ত।

ওকে ধরা যায় না।

তাই গৌরীর প্রেম—বাসনার স্বপ্ন—কোন কিছুই তাকে বাধা দিতে পারে না। প্রতিহিংসাও তার নেই, তাই যেন বিনোদকেও সে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

আবার ছায়াঘন দেবগ্রামে নেমেছে প্রশান্তির ছোঁয়া।

এখানের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকতা ফুটে ওঠে। পাখী ডাকে।

ফুল ফোটে—দীঘির কাজল কালো জলে ডাহুক দম্পতির ডাক শোনা যায়, বড়বাড়ির ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে রাত্রির তমসা নামে।

একটি ব্যর্থ বন্দী নারী এই অতল তমসার অতলে শোনে তার মনের হাহাকার। বাসনা যেন এই বড় বাড়ির অতন্দ্র প্রহরী।

...এখানে আর সুর ওঠে না—সব সুর থেমে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। আপনার সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু নিয়ে বয়ে চলে দেবগ্রামের জীবন ধারা।

ললিত এখানে যেন কোন দিনই আসেনি।

শুধু গৌরীর মনে হয় কবে কোন রাত্রে সে প্রেম প্রেম স্বপ্ন দেখেছিল কার সোহিনীর আলাপে, যোগিয়ার করুণ সুরে সেই স্বপ্ন ব্যর্থতার রেশটুকুই ছড়িয়ে পড়ে দূর আকাশ বাতাসে। সেই সুরকে অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায় না।